UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI **CODE:19**

Unit – 7 প্রবন্ধ, আত্মজীবনী ও সাময়িক পত্র

Sub Unit – 1:

রামমোহন রায়: সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (প্রথম প্রস্তাব)

Sub Unit – 2:

মনুষ্যফল (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
বড়বাজার (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
বিদ্যাপতি ও জয়দেব (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

Sub Unit – 3:

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

Sub Unit – 4:

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)
নূতন কথা গড়া (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)
বাঙ্গালা ভাষা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

Sub Unit – 5:

সৌন্দর্যতত্ত্ব (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)
সুখ না দু:খ (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)
অতিপ্রাকৃত-১ম প্রস্তাব (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)
নিয়মের রাজত্ব (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)

Sub Unit – 6:

ভারতচন্দ্র (প্রমথ চৌধুরী)
বইপড়া (প্রমথ চৌধুরী)
মলাট সমালোচনা (প্রমথ চৌধুরী)
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা (প্রমথ চৌধুরী)
কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত (প্রমথ চৌধুরী)

Sub Unit – 7:

শিল্পে অনধিকার (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
শিল্পে-অধিকার (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
দৃষ্টি ও সৃষ্টি (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
সৌন্দর্যের সন্ধান (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Sub Unit – 8:

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ভারত সংস্কৃতির স্বরূপ পারিবারিক নারী সমস্যা (অন্নদাশঙ্কর রায়)

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 9:

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক (বুদ্ধদেব বসু)
রামায়ণ (বুদ্ধদেব বসু)
উত্তরতিরিশ (বুদ্ধদেব বসু)
জীবনানন্দ দাশ এর স্মরনে (বুদ্ধদেব বসু)
পুরানা পল্টন (বুদ্ধদেব বসু)

Sub Unit – 10:

অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা সুন্দর ও বাস্তব ভূমিকা-আধুনিক বাংলা কবিতা (আবু সয়ীদ আইয়ব)

Sub Unit – 11:

আত্মজীবনী আমার জীবন (রাসসুন্দরী দাসী)

Sub Unit – 12:

তত্ত্ববোধিনী (সাময়িক পত্র)
বঙ্গদর্শন (সাময়িক পত্র)
প্রবাসী (সাময়িক পত্র)
সবুজপত্র (সাময়িক পত্র)
কল্লোল (সাময়িক পত্র)

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 1

সহমরন বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ (প্রথম প্রস্তাব) - রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রী: হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকান্ত রায়। মাতা তারিণী দেবী, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের জন্য গদ্য রচনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮১৫-১৮৩০ খ্রী: মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে ত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই বাংলা ভাষার বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার। বৈদিকধর্মের আধ্যাত্ম বিশ্লেষনমূলক গ্রন্থগুলি হল 'বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫)', 'বেদান্তসার' (১৮১৫) রচনা করেন। কেন, ঈশ, কট, মান্ডুক্য ও মুন্ডক উপনিষদের অনুবাদ করেছেন। ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনার জন্য তিনি 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) স্থাপন করেছিলেন। 'ব্রাহ্মন সেবধি' (১৮২১) 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন করে প্রকাশ করেছিলেন। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ'- প্রবন্ধটি রামমোহন রায়ের সহমরণের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষায় প্রথম পুস্তক। পতির মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর সহমরণকে কেন্দ্র করে রামমোহনের এই প্রবন্ধটি রচিত। রামমোহন নিজে উদ্যোগ নিয়ে সহমরন প্রথা তৎকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই নিচ পৈশাচিক প্রথাকে নিয়ন্ত্রন করার চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে তাকে আইনি রূপ দিতে পারেননি। রামমোহন তাঁর সহমরন বিষয়ক দুটি প্রবন্ধে তথ্য ও তত্ত্বের যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে স্বামী মারা গেলে সদ্য বিধবাকে স্বামীর চিতায় সহমরনে যেতে হবে শাস্ত্রে এমন কোনো প্রমান নেই। এই প্রবন্ধের বক্তব্যে অনুপ্রানিত হয়ে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ১৮২৯ খ্রী: ৪ টা ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথাকে আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রক্ষনশীল হিন্দুরা সতীদাহ প্রথা লোপ পেলে হিন্দুধর্ম লোপ পাবে বলে অপপ্রচার চালায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহন রায় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংলাপের মিশ্রণে উপরিউক্ত গ্রন্থটি রচনা করে সহমরন যে অশাস্ত্রীয়, অমানবিক, নিপীড়ন, নারী সমাজের প্রতি বর্বরোচিত অত্যাচার তা প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্য

১। সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ এর ইংরেজি অনুবাদ -"Translation of a conference between an advocate and an opponent of the pratice of learning windows alike"
২। ইংরেজি অনুদিত বইটি কলকাতার ব্যপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত (৩০শে নভেম্বর ১৮১৮) এবং পরে ইংল্যান্ড থেকে তাঁর রচনাবলীর অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয় ১৮৩২ এ।
৩। প্রবন্ধটি প্রশ্নোত্তর ধর্মী। প্রবর্তক প্রশ্নকর্তা আর উত্তরদাতা নিবর্তক।
৪। প্রবর্তক সর্বমোট ১৩ টি প্রশ্ন করেছেন। নিবর্তক ১৩ টি প্রশ্নের ব্যাখ্যা ধর্মী উত্তর দিয়েছেন।
৫। প্রথম শ্লোক- 'ওঁ তৎ সৎ'।
৬। সহমরণ ও অনুমরণ সম্পর্কে শাস্ত্রের নিষিদ্ধ বিষয়ে অঙ্গিরা মুনির কথা প্রবর্ত্তক প্রথম উল্লেখ করেছেন।
৭। বিধবা ধর্মের সপক্ষে নিবর্ত্তক মুনির যুক্তি তুলে ধরেচেন।
৮। বশিষ্ট এবং তাঁর পত্নী অরুন্ধতীর উল্লেখ আছে।
৯। অরুন্ধতীর স্বামীর মৃত্যুর পর জ্বলন্ত চিতাতে আরোহন করে স্বর্গে যায়।
১০। ব্যাস-এর লেখা কপোত-কপোতীর ইতিহাসের কথা উল্লেখ আছে।
১১। মনু বিধবাকে ব্রহ্মচর্যের বিধি দিয়েছেন অপরপক্ষে বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরন উভয়ের বিধান দিয়েছেন।
১২। স্বামী, স্ত্রী স্নান আচমন পূর্বক পতির পাদুকা দুটিকে বক্ষস্থলে গ্রহন করে অগ্নিতে প্রবেশ করার কথা আছে ব্রহ্মপুরানে।
১৩। ঋকবেদের উল্লেখ আছে।
১৪। বেদের শাসন অনুযায়ী ইতর বর্নের কোনো স্ত্রী তাদের অনুমরনকে তপস্যা করেন।
১৫। বেদের শাসন অনুযায়ী মৃত পতির অনুমরন ব্রাহ্মনী করবেন।
১৬। মনু সংহিতার কথা বলেছেন নিবর্ত্তক
১৭। মনহরি সংকীর্তন করতে বিধি দেননি।
১৮। ব্যাস হরি সংকীর্তন করতে বলেছেন।
১৯। নিবর্ত্তক দয়া প্রসঙ্গে শাক্ত পূজা ও বৈষ্ণবদেবের উল্লেখ করেছেন।
২০। প্রবন্ধে, 'কঠোপনিষৎ' ও 'মুন্ডকোপনিষৎ এর উল্লেখ আছে।

২১। কঠোপনিষৎ অনুযায়ী-শ্রেয়ু অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয়।
২২। প্রেয় এবং শ্রেয় এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যাক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তার কল্যাণ হয়।
২৩। যে কামনা সাধন কর্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ থেকে পরিভ্রষ্ট হয়। মুন্ডকোপোনিষৎ অনুসারে -
২৪। অষ্টাদশাঙ্গের যে যজ্ঞরূপ কর্ম তাতে সকলেই বিনাশ হয় এবং তাই শ্রেয় মনে করা হয়।
২৫। যারা অজ্ঞান রূপ কর্ম কান্ডতে মগ্ন হয়ে অভিমান করে নিজেদের জ্ঞানী এবং পন্ডিত মনে করে তারা জন্ম থেকে জন্মমরন দু:খে বারবার ভ্রমণ করেন।
২৬। মূঢ় ব্যাক্তিরা বেদ শ্রবন করে তাকেই ঈশ্বর মনে করে।
২৭। গীতায় বলা হয়েছে বিদ্যা থেকে অধ্যাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ট।
২৮। নিবৃত্ত কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা শরীরের কারন পঞ্চভূত মুক্ত হয়।
২৯। নিবর্তক বেদ, মনু ও ভাগবত গীতা সম্মত উক্তি দেন।
৩০। মানুষের প্রবৃত্তি কাম, ক্রোধ ও লোভেতে আচ্ছন্ন।
৩১। জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হয়ে মনুষ্য প্রাপ্ত হয়।
৩২। ঈশ্বরের ভয় ও ধর্ম ভয় ও শাস্ত্র ভয় এ সকলকে ত্যাগ করে স্ত্রী হত্যা রোধ করার কথা বলা হয়েছে।

মন্তব্য

ক) ‘রামমোহন বাংলা গদ্য ভাষারও অন্যতম শ্রেষ্ট পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্যের কেবল সূচনা হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু তাহা কোন স্থিতিশীল আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যত্য অর্জন করে নাই‘। (অধীর দে: আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা)

খ) ‘রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন পেশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়া ছিলেন।‘ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য)

গ) ‘একই সঙ্গে সনাতন ও সমকালীন, ঐতিহ্যবাদী ও প্রগতিবাদী, ধর্ম ও কর্ম, প্রাচ্যের সাত্ত্বিক ধ্যানমূর্তি এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানকর্ম চঞ্চল রাজসিকতা-রামমোহন যেন এই সমন্বয়ের প্রতীক‘। (তার্যিত কুমার বন্দোপাধ্যায়; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত)

teachinns Text with Technology

Sub Unit-2

মনুষ্যফল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৪৫ সালেই ১৩ই আগষ্ট কাঁটলপাড়ায় জন্মগ্রহন করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা দুর্গাদেবী। বাল্যকাল থেকে তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে বড় হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রথম উপন্যাস ইংরেজি ভাষায় লেখেন/ তার নাম- "Rajmohan's Wife"। ছোটবড় মিলিয়ে মোট চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস হল 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা শুরু। সমাজ ইতিহাস-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ রচনাতে তিনি মননশীলতা ও পান্ডিত্যের পরিচয় রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল - 'লোকরহস্য'(১৮৭৪), 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথমভাগ, ১৮৮৭), 'ধর্মতত্ত্ব'(১৮৮৮), 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা' (১৯০২) ইত্যাদি।

মনুষ্য জীবন অনেকটা ফলের মতো বহু জন্মের পর মনুষ্য জীবন লাভ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নারিকেলের ডাল ও শস্য অবস্থাভেদে স্ত্রী লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কথা বলেছেন। নারিকেলের চারটি সামগ্রীর সঙ্গে স্ত্রী লোকের চারটি গুনের তুলনা করেছেন। নারিকেলের কচি অবস্থা হল ডাব। এর ডাবের জলই উপাদেয় নারিকেল ঝুনো হলো তার জল বনাল হয়ে যায়। এই জলের সঙ্গে স্ত্রী লোকের স্নেহের তুলনা করা হয়েছে। ডাব অবস্থায় নারিকেলের শস্য কোমল ও সুমিষ্ট। নারিকেলের শস্যের সঙ্গে স্ত্রী লোকের বুদ্ধির তুলনা করা হয়েছে। নববধূর বুদ্ধিও তেমনি সদর্থক। নারিকেলের ঝুনো হলে তার শাঁস শক্ত হয়ে যায়। সেইরকম বধূ গৃহিনী হলে তার বুদ্ধিও ধারালো হয়ে ওঠে। নারিকেলের মালার ন্যায় স্ত্রী লোকের বিদ্যাও দ্বিখন্ডিত। তার প্রমান হিসেবে কমলাকান্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন জেনঝ অস্টেন বা জর্জ এলিয়টের উপন্যাস কিংবা মেরি সমরবিলের বিজ্ঞান বিষয়ক কোন গ্রন্থ। নারিকেলের ছোবড়া ও স্ত্রী লোকের রূপ। দুটি অসার। কমলাকান্ত তাই দুটি ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কমলাকান্ত অকৃতদার। নারীবিদ্বেষী নন, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা অসামর্থে তার বিবাহ করা হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি মানবী-নারিকেল ফলটিকে বিশ্বেশ্বরকে উৎসর্গ করে 'কমফার্ম ব্যাচেলার' জীবন যাপন করেন।

তথ্য

১। 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটি 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।
২। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধ গ্রন্থটি রামদাস সেন মহাশয়কে উৎসর্গ করেন।
৩। 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় আশ্বিন ১২৮০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
৪। প্রাবন্ধিকের মতে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মানুষ পৃথক জাতীয় ফল।
৫। প্রাবন্ধিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে যে যে ফলের সাথে তুলনা করেছেন-বরমানুষ-কাঁটাল, সিভিল সার্ভিসের সাহেব-আম্রফল।
স্ত্রীলোক (লৌকিক কথায়) - কলাগাছ
স্ত্রীলোক (প্রাবন্ধিকের নিজস্ব মত) - নারকেল
দেশহিতৈষী-শিমুল ফুল
দেশের লেখকেরা-তেঁতুল
৬। 'মনুষ্য ফল' প্রবন্ধের শুরুতে আফিম মাদক দ্রব্যের উল্লেখ আছে।
৭। শৃগালের পদাধিকার ও ভিন্নরূপ-দেওয়ান কারকুন, নায়েব, গোমস্তা, মোসাহেব।
৮। মাছি কাঁঠালের প্রত্যাশা করে না, রসের আশা করে।
৯। প্রাবন্ধিকের মতে নারীরা এ সংসারের নারকেল।
১০। নারকেলের চারটি সামগ্রী - জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া।
১১। প্রবন্ধে পদী পিসীর রান্নার কথা বলেছেন। পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাত:স্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা কিন্তু রাঁধবার বেলা কলাইয়ের ডাল, তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছু রাঁধতে জানেন না। ফয়ুজ জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১। ‘পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল‘।
২। ‘এক্ষণকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়‘।
৩। ‘মাঝিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন‘।
৪। ‘এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন।
৫। ‘রমণীমন্ডলী এ সংসারের নারিকেল‘।
৬। ‘সংসারশিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহন করিও না-তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে‘।
৭। ‘নারিকেলের চারটি সামগ্রী-জল, শস্য, মালা এবং ছোবড়া‘।
৮। ‘নারিকেলের শস্য, স্ত্রী লোকের বুদ্ধি।
৯। ‘মালা-এটি স্ত্রী লোকের বিদ্যাস-যখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না‘।
১০। ‘ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অগশ, রূপ ও স্ত্রী লোকের বাহ্যিক অংশ‘।
১১। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে‘।
১২। ‘বঙ্গীয় লেখকরা আপনাপন প্রবন্ধ মধ্যে অধ্যাপক দিগের নিকট দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন‘।
১৩। ‘সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকম্মর্ণ্য, কদর্য্য, টক‘

বড়বাজার/ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখকের রূপকে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নাম ধারন করে বেরিয়েছেন বাজারে। কমলাকান্তের মনে হয়েছে বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার। সেখানে সকলেই দোকান সাজিয়ে বসে আছে। সকলের উদ্দেশ্যে মূল্য প্রাপ্তি। নসীরামবাবুর গৃহে প্রসন্ন গোয়ালিনীর তৈরী দুগ্ধজাত ক্ষীর, সর, দই, ননী খেয়ে কমলাকান্তের দিনগুলি ভালো কাটছিল। গোল বাঁধে দুধের দাম চাওয়ায়। দাম দিতে না পারায় প্রথমে গালি, পরে যোগার বন্ধ হয়ে যায়। তখন কমলাকান্তের মনে দার্শনিক প্রত্যয়ের জন্ম হয়। আফিমের নেশার দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন কলুপটিতে উমেদার, মোসারের সকলে কলু সেজে কাজ হাসিল করার জন্য তেল দিচ্ছে। আফিমের নেশা কেটে যেতে বড়বাজারের পরিচয় আর বিস্তৃতি লাব করেনি। তখন প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণ দূর হয়েছে।

তথ্য

১। ‘বড়বাজার‘ প্রবন্ধটি ‘কমলাকান্তের দপ্তর‘ গ্রন্থের দশম প্রবন্ধ।
২। ‘বঙ্গদর্শন‘ পত্রিকায়, আশ্বিন, ১২৮১ সংখ্যায় ‘বড়বাজার‘ প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
৩। কমলাকান্ত নসীরাম বাবুর গৃহে গিয়ে ক্ষীর, দুধ, দই ও নবনীত খেয়েছেন।
৪। প্রসন্ন মূল্য চাইলে প্রাবন্ধিক যা করেছেন -
   ১ম দিনে - রসিকতা করে উড়িয়ে দিলেন
   ২য় দিনে - বিস্মিত দিলেন
   ৩য় দিনে - গালি দিলেন
৫। কমলাকান্তের মতে, মূল্য দিয়ে কিনতে হয় কলেজের বিদ্যা, অনেক ভালো কথা, হিন্দুদের ধর্ম, যশ:, মান।
৬। প্রাবন্ধিক বৃথা গল্প, আকাশ কুসুম, ছায়াবাজি বলেছেন ভক্তি, প্রিতি, স্নেহ প্রনয়কে।
৭। পৃথিবীর রূপসীগণকে মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
৮। এই প্রসঙ্গে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনো, পুঁটি, কই প্রভৃতি মাছের উল্লেখ আছে।
৯। এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকান ঘরের উপর বড় বড় পিতলের অক্ষরের দোকানের নাম লেখা ছিল - Misser Brown Jones and Robinson
১০। এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের দোকানটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৫৭ সালে। এই সালটি ইংরেজিতে লেখা ছিল।
১১। বাঙ্গালা সাহিত্য হল অপঙ্ক কদলী।
১২। সাহিত্যের বাজারে সংস্কৃত সাহিত্য বিক্রি করেছিলেন বাল্মীকি প্রভৃতি ধনষিগন।
১৩। সাহিত্যের বাজারে পাশ্চাত্য সাহিত্য ছিল নিচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর, প্রভৃতি সুস্বাদু ফল।
১৪। কথক যে খাঁটি দোকান দেখেছিলেন তার ফলকে লেখা ছিল:
   বিক্রেতা-যশের পণ্যশালা
   বিক্রয়-অনন্ত যশ
   মূল্য-জীবন
জীয়ন্তেকেই এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১। 'সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা'।
২। 'মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর'।
৩। 'ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রায়াদি সকলই বৃথা গল্প'।
৪। 'গোরু কাহারাও নহে; গোরু গুরুর নিজের, দুধ যে খায় তাহারাই'।
৫। 'হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া যা কেন?'।
৬। 'এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার-সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান, সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্য প্রাপ্তি'।
৭। 'সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্য জীবন বলে'।
৮। 'কার্য্যকারন সন্মন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে কম দিলেই অকার্য্য'।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নেই। বরং অন্যান্য ভাষার থেকে বাঙ্গালায় গীতিকবিতা অনেক বেশি। জয়দেব ছিলেন এই গীতিকাব্যের প্রনেতা। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' এই প্রবন্ধটিতে গীতিকবিদের দুটি দলে ভাগ করে নিয়েছেন-
১) বহি:প্রকৃতির কবি, ২) অন্ত:প্রকৃতির কবিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকে অন্ত:প্রকৃতির প্রধান কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে বিদ্যাপতিকে বহি:প্রকৃতির কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন অন্ত:প্রকৃতির যর্থাথ কবি চন্ডীদাস। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে বিদ্যাপতি ও জয়দেব উভয়েই বহি:প্রকৃতির কবি। চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির জাত সম্পূর্ন পৃথক। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাই স্বীকার করতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন 'জয়দেব সুখ বিদ্যাপতি দু:খ' রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বিদ্যাপতি সুখের কবি চন্ডীদাস দু:খের কবি'। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকে রবীন্দ্রনাথের মতো সুখের কবি বলতে পারেননি। তবে পরিবর্তিত পাঠে বিদ্যাপতির দু:খবার অনেকখানি লাঘব করেছেন।

তথ্য

১। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দে 'মানববিকাশ' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়।
২। আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৮৭৬ খ্রী: 'বিবিধ সমালোচনা' গ্রন্থে অর্ন্তভুক্তিকালে নামে দেন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। পরবর্তীকালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও প্রথম ভাগ (১৮৮৭) গ্রন্থে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি পরিবর্তিত আকারে গৃহিত হয়।
৩। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন - দৃশ্যকাব্য, আখ্যান কাব্য, খন্ডকাব্য।
৪। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে প্রাবন্ধিক 'গীতিকাব্য' বলেছেন।
৫। রামপ্রসাদ সেন একজন প্রসিদ্ধ-গীতিকবি।
৬। যেসব কবিওয়ালাদের নামের উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন - রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাস।
৭। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলয় বা ম্যাক্সমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য।
৮। বিদ্যাপতির গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রনয়।
৯। জয়দেবের গীতের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বিলাস।
১০। প্রাবন্ধিকের মতে, এখনকার কবিরা জ্ঞানী-বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ।
১১। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরন জয়দেব।
১২। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ Wordsworth.

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যে দু:খই থাকুক উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই‘।
২। ‘সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল‘।
৩। ‘সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র‘।
৪। ‘ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষ। এই ধর্ম্ম মোহের ফল পুরান‘।
৫। ‘যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সন্মন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চন্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশি খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।‘।

৬। ‘জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ন বিদ্যাপতির গীত, রাধাকৃষ্ণের প্রনয় পূর্ন জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দু:খ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।
৭। ‘বিদ্যাপতির প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতায় বিষ বিস্ফৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে‘।
৮। ‘জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া প্রবাদ আছে‘।
৯। ‘জয়দেবের কবিতা উৎফুল্ল কমল জাল শোভিত, বিহঙ্গ মাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর। বিদ্যাপতির কবিতা দুরগামিনী বেগবতী তরঙ্গ সঙ্কুলা নদী‘।
১০। জয়দেবের কবিতা স্বর্নহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা।

শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচ্যকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‘ নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে প্রতীচ্যের কবি, ও নাট্যকার শেক্সপীয়রের ‘দ্য টেম্পেস্ট‘ ও ‘ওথেলো‘ নাটকদ্বয়ের দুই নায়িকা যথাক্রমে মিরন্দা ও দেসদিমোনার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই লোকালয় থেকে দূরে শকুন্তলা অরন্য এবং মিরন্দা নির্জন দ্বীপে প্রকৃতির কোলে লালিত। উভয়েই "Love at first sight" এর সূত্রে, প্রথম দর্শনেই প্রনয়াবদ্ধ। এই উভয়বিধ ঘটনাগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যে উভয়েই সমুজ্জল। শকুন্তলা আপন ব্যাক্তিত্বে ও আত্মমর্যাদাবোধে এতটাই উদ্দীপ্ত যে, দুষ্মন্তের পত্নীত্যাগের সিদ্ধান্তে কষ্ট ও কটুবাক্যে স্বামীকে ভৎসর্না করতে দ্বিধা বোধ করেননি। দেসদিমোনা স্বামীর সন্দেহের যূপকাষ্টে আত্মোৎসর্গ করেছেন। এই তিনটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খুব সুন্দরভাবে বর্নীত হয়েছে।

তথ্য

১। ‘শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা‘ প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বৈশাখ, ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৮৭৬ খ্রী: ‘বিবিধ সমালোচনা‘ নামক গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত হয়।
২। শকুন্তলা চরিত্রটি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম‘ দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত।
৩। শকুন্তলা ‘মিরন্দা এবং দেসদিমোনা‘ প্রবন্ধটি দুটি অংশে পৃথক করে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থাপিত করেছেন।
প্রথম অংশ - শকুন্তলা ও মিরন্দা, দ্বিতীয় অংশ - শকুন্তলা ও দেসদিমোনা
৪। মিরন্দা শেক্সপিয়ারের কমেডি নাটক ‘দি টেমেস্ট‘ এর চরিত্র।
৫। দেসদিমোনা শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডি নাটক ‘ওথেলো‘র চরিত্র।
৬। শকুন্তলার পিতা-বিশ্বামিত্র।
৭। মিরন্দার পিতা-প্রস্পেরো।
৮। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়েই ঋষিকন্যা এবং ঋষি পালিতা।
৯। সমাজপ্রসন্ন যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তা সবই আছে, মিরন্দার তা কিছুই নেই।
১০। শকুন্তলা ও দেসদিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া ক) উভয়েই বীরপুরুষ দেখে আত্মসমর্পণ করেছেন। খ) উভয়েই পরম স্নেহশালিনী গ) উভয়েই স্বামী কর্তৃক বিসর্জ্জিত হয়েছেন। ঘ) উভয়েই সতী।১
১১। শকুন্তলা সরলা হলেও অশিক্ষিত নন। তাঁর শিক্ষার চিহ্ন তাঁর লজ্জা।
১২। মিরন্দা এত সরল যে, তার লজ্জা নেই।
১৩। শেক্সপীয়ারের নাটক সাগরতুল্য, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন।

১৪। প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিম বলেছেন - 'শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমোনা, পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিনী, অপরিনীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিনী'।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১। 'শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা'।
২। 'মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই'।
৩। 'মিরন্দা এরিয়ল রক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা'।
৪। 'কবিদিগের আশ্চর্য কৌশলী দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। অথচ একজন দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে'।
৫। 'শকুন্তলা সমাজ প্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রনয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষনেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয় লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফূট হইবে'।
৬। 'মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহো-মিরন্দা বনের পাখি - প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না, বৃক্ষের ফুল-সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে লজ্জা করে না'।
৭। 'দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয়ে সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে'।
৮। 'মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়'।
৯। 'যদি স্বামীর প্রতি অবিচল ভক্তি-প্রহারে অত্যাচারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেসদিমোনা গরিয়সী'।
১০। 'পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী'।

বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় আর্বিভাবের প্রেক্ষাপট নির্দেশ করে পত্রিকার উদ্দেশ্যে ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ইংরেজি প্রিয় বাঙালির বাংলা ভাষায় লেখা গ্রন্থ পড়েন না। বাংলা ভাষায় যা লেখা হয় তা অপাঠ্য এবং ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ তাই এখন বাংলা গ্রন্থাদি কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য, বিদ্যালয়ের পন্ডিত কদাচিৎ কৃতবিদ্যাধর ব্যক্তিরা পড়েন। লেখাপড়া থেকে শুরু করে সাধারন মিটিং, কাজ, লেকচার এমন সমস্ত কিছু হচ্ছে ইংরেজিতে। শিক্ষিত ইংরেজি প্রিয় কৃতবিদ্য বাঙালিরা বাংলা ভাষায় লেখেন না, কারন ইংরেজরা তা বোঝে না, আর ইংরেজ না বুঝলে মান-মর্যাদা থাকে না। বাঙালী-ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় মাতৃভাষা স্থলভুক্ত করেছেন। বাঙালি যদি মাতৃভাষাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করে, তবে বাঙালির উন্নতি সম্ভব নয়। সেইজন্য প্রাবন্ধিক সুশিক্ষিতের উপযোগী করে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন।

এই পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র জাতি ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সকলের পাটোপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাধারন মানুষের সহাদয়তা গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস করেছেন। সাফলা ও ব্যর্থতার বিচারকে মহাকালের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

তথ্য

১। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বৈশাখ, ১২৭৯ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯২) গ্রন্থে গৃহিত হয়।
২। যাঁরা 'বিষয়ী লোক' তাঁদের পক্ষে সকল ভাষাই সমান।
৩। নব্য সম্প্রদায়ের যে যে কাজ বাঙ্গালায় না হয়ে ইংরেজিতে হয় বলে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন-
ক) বিদ্যালোচনা
খ) সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেকচর, এড্রেস, প্রোসিডিংস।
গ) উভয়পক্ষ ইংরেজি জানলে কথোপকথন হয় ইংরেজিতে।
ঘ) পত্রলেখা।

৪। বাঙ্গালা ভাষার লেখক মাত্রই হয় বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি কৌশল শূন্য; নয় ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদক।
৫। ইংরেজের কাছ থেকে এ দেশের লোকের যত উপকার হয়েছে ইংরেজি শিক্ষাই তার মধ্যে প্রধান।
৬। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী- এদের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা।
৭। বাঙ্গালায় যে কথা বলা হবে না তা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝবে না বা শুনবে না।
৮। সমাজ মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকলে সমাজের যেরূপ অনিষ্ট হয় তার উদাহরন স্পাটা, ফ্রান্স, মিশর এবং ভারতবর্ষ।
৯। এথেন্সে সকলে সমান স্পাটায় এক জাতির প্রভু। এক জাতি দাস ছিল।
১০। 'আপরিতোষদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োবিজ্ঞানম'- এই শ্লোকটি প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে।
১১। 'যত গর্জে তত বর্ষে না'- প্রবাদটি প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

উদ্ধৃতি

১। 'যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাদিগের বিশেষ দূরদৃষ্ট'।
২। 'যাঁহারা, 'বিষয়ী লোক' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান'।
৩। 'ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিস্তার আধার, এক্ষনে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিস্তার আধার, এক্ষনে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালিরা তাহার শৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন।
৪। 'ইংরাজি যাহা না শুনিল, সে অরন্যে রোদন; ইংরাজি যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত'।
৫। 'বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজি অনেকগুনে গুণবান, এবং অনেক সুখে সুখী'।
৬। 'গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপ ভালো'।
৭। 'প্রস্তরমুখী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিত বন্যনারী জীবনযাত্রার সুসহায়'।
৮। 'নকল ইংরাজি অপেক্ষায় খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়'।
৯। 'সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোনো মঙ্গল নাই'।
১০। 'উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দু:খে দু:খী নহেন'।
১১। 'মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদিগের কোনো সুখে সুখী নহে'।
১২। 'এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্র লোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল'।
১৩। 'পাঠক বা শ্রোতাদিগের সহিত সহৃদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্তত:সিদ্ধ গুণ'।
১৪। 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালী দিগের অভিপ্রায় সকল সাধারনত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারন বাঙ্গালি তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাঁহাদিগের সংস্রবে আসে না'।
১৫। 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালা পড়ে না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না'।
১৬। 'লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী'।
১৭। 'যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যে পড়িয়া শেষ করা যায়'।
১৮। 'বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই বাঙ্গালা অনাদর বাড়িতেছে'।
১৯। 'যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত্ন করে'।
২০। 'একখানি সমায়িক পত্রের ক্ষনিক জীবনও নিস্ফল হইবে না'।
২১। 'এ জগতে কিছুই নিস্ফল নহে'।
২২। 'বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল, নিয়মবলে বিলীন হইবে'।
২৩। 'আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র'।

Sub Unit-3

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯ শে পৌষ উত্তর কলকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে স্বামী বিবেকানন্দ বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবেনশ্বরী দেবী। কলকাতায় সুরেন মিত্রের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ১৮৮৭ খ্রী: জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নরেন্দ্রনাথ বিরাজ হোম করে সন্ন্যাস গ্রহন করেন। তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৮৮ তে বরাহনগর মঠ থেকে পরিব্রাজক রূপে বেরিয়ে পড়েন। ১৮৯৭ খ্রী; ১লা মে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ খ্রী: ৯ই ডিসেম্বর বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। ১৯০২ খ্রী: ৪-ঠা জুলাই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মহাসমাধি লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ একজন সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল -'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৫)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের জন্য বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটিতে ১৮টি বিভাগ সন্নিবেশিত। প্রত্যেকটি বিভাগে নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ধর্ম, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইতিহাস, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়কে ভিত্তি করে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন করেছেন। প্রথমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে-এখানে ভারতীয়দের চোখে বিদেশিদের অবস্থান এবং বিদেশিদের চোখে ভারতীয়দের দারিদ্র্য সঙ্কুল চিন্তা-চেতনটিকে তাৎপর্যমন্ডিত ভাবে আলোচনা করেছেন বিবেকানন্দ। ইংরেজদের চোখে ভারতীয়রা কদর্য, কুসংস্কারপূর্ন নীচ, বলহীন, আশাহীন। ভারতবাসীর চেতনায় পাশ্চাত্যরা হিংস্রপশুর ন্যায় ভয়ানক। কমোন্ম ও আপাদমস্তক সুরাসিক্ত দেহাত্মবাদী ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিবাগে ধর্ম ও মোক্ষ এই অংশে ধর্ম ও মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা আছে। প্রাচ্যের অর্থাৎ ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে মুক্তি আর বিদেশিরা (পাশ্চাত্যরা) চায়-ধর্ম।

দ্বিতীয় বিভাগে ধর্ম ও মোক্ষ: এই অংশে ধর্ম ও মোক্ষ সম্পর্কে আলোচনা আছে। প্রাচ্যের অর্থাৎ ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে মুক্তি আর বিদেশিরা (পাশ্চাত্যরা) চায়-ধর্ম।

তৃতীয় বিভাগে স্বধর্ম বা জাতিধর্ম: বৈদিক ধর্ম যেটি স্বধর্ম ও জাতিধর্ম সম্পর্কে সামাজিক কল্যানমূলক বিষয়ের বর্ননা এখানে আছে। ভারতের স্বধর্ম কি তার বার্তা এবং সেই সঙ্গে বিদেশীয় নানান জাতির ধর্ম এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কিঞ্চিৎ আভাসের আলোচনা রয়েছে।

চতুর্থ বিভাগে শরীর ও জাতিতত্ত্ব: সাদা চামড়া, কালো চামড়া পরিবেশ ভেদে বর্ণ মাস্কর্যের বিষয় আছে।

পঞ্চম বিভাগে পোশাক ও ফ্যাশন: ভারতীয় ছেলে মেয়েরা কি ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, বিদেশীয়রা কি ব্যবহার করেন তার বর্ণনা আছে এই অংশে।

ষষ্ঠ বিভাগে পরিচ্ছন্নতা: ভারতীয়রা কি আকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন তার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করবেন আর বিদেশীদের কাছে কি কি নিতান্ত অভদ্রতর তারই বর্ননা আছে।

সপ্তম বিভাগে আহার ও পানীয়: প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে খাদ্যের বৈষম্য কোন ধরনের, কিরকম পরিবেশে জলবায়ুতে কি খাদ্য বেশি সুপাচ্য সে বিষয়ে আলোচনা আছে।

অষ্টমবিভাগে পোশাক পরিচ্ছদ: আর্য জাতিরা ধুতি চাদর পরত, ক্ষত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা লড়াইয়ের সময় পরত এই সমস্ত বিষয় বর্নিত আছে।

নবম বিভাগে রীতিনীতি: ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় কেমন রীতিনীতি, ফরাসি দেশে কি সাবধনতা, পাশ্চাত্যে ভদ্র সমাজে থুতু ফেলা, বুলবুচা করা, ইত্যাদিতে চন্ডালত্ব প্রাপ্তি।

দশমবিভাগে পাশ্চাত্য শক্তি পূজা: মা মেরীর প্রসঙ্গ, আমাদের দেশে কুমারী পূজা, কাশী, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থান বসন, ভূষণ, আদর খ্যাতির প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা।

একাদশবিভাগে ইউরোপের নবজন্ম: প্যারিসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতালির নবজন্ম, তারপর ইউরোপের জন্ম প্রভৃতি।

দ্বাদশ বিভাগে ফ্রান্স ও প্যারিসের ইতিহাস বর্ণনা।

ত্রয়োদশ বিভাগে পরিনামবাদ: ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি প্রায় পরিণামবাদ আর এই পরিনামবাদ ইউরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে।

চতুর্দশতম বিভাগে সমাজের ক্রমবিকাশ।

পঞ্চদশতম বিভাগে দেবতা ও অসুর: পৃথিবীর বির্বতনের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে জীবিকা, পরিবেশ, আর জলবায়ুর উপর নির্ভর করে দেবতা ও অসুর সৃষ্টি হয়েছে তার আলোচনা আছে।

ষষ্টদশতম বিভাগে দুই জাতির সংঘাত: কীভাবে জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইউরোপের উপর আঘাত হানেন, ইউরোপ ধ্বংসের পর অবশিষ্ট রোমক গ্রিক মিলে অভিনব জাতির সৃষ্টি হল সেই সম্পর্কিত আলোচনা আছে।

সপ্তদশ বিভাগে তাতার জাতির কথা বর্নিত আছে।

অষ্টাদশ বিভাগে উভয় সভ্যতার তুলনা: এই অংশে, মুসলমান এবং ইউরোপী সভ্যতা সম্পর্কে তুলনা মূলক আলোচনা আছে।

তথ্য

১। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে (১৩০৬-৭ ও ১৩০৭-৮) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

২। ১৩০৯ খ্রী: 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৩। ইউরোপী পর্যটক ভারতে যে রূপ দেখেন- বিসূচিকার আক্রমন, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়া, অনশন-অধাশন, দুর্ভিক্ষ, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আনন্দ উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহাশ্মশান আর ধ্যানমগ্ন মোক্ষ-পরায়ন যোগী।

৪। বিদেশীকে আমরা ভারতীয়রা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেছ' বলি ওরাও আমাদের ঘৃনা করে 'কালো দাস' বলে।

৫। শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন-এ দেশে চিরকাল।

৬। আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেডোর' প্রাধান্য আর পাশ্চাত্যে 'ধর্মের প্রাধান্য'।

৭। 'মোক্ষ শব্দের অর্থ সর্ব্বন্ধন হতে মুক্তি'।

৮। হিন্দুশাস্ত্র বলেছেন যে 'ধর্মের' চেয়ে মোক্ষটা অনেক বড়। কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই।

৯। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-এই চারটি পুরুষার্থ বলে শাস্ত্রে কথিত আছে। 'কাম' শুধু নিজেই সুখই চায়, অপরের সুখ চায় না। 'অর্থ'- যার দ্বারা জীব নিজের এবং অপরের সুখ আকঙ্খা করে। ধর্ম অর্থে কর্তব্য বা স্বকর্ম দ্বারা অর্জিত সুখ বোঝায়। মোক্ষ- সর্বপ্রকার সুখ দু:খের বন্ধন থেকে মুক্তিকেই 'মোক্ষ বলা হয়। এই চারটিকে 'চতুবর্গ' ও বলা হয়।

১০। স্বামীজি বুদ্ধদেবকে 'আমার ঈশ্বর' বলতেন।

১১। যখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীস্ম, কর্ন, ব্যাস, শুক ডানকাদি বর্তমান ছিল তখন ধর্ম ও মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল ভারতবর্ষ।

১২। স্বামীজি জাতিধর্ম বা স্বধর্ম বলতে গীতোক্ত স্বধর্মের কথা বলেছেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মবিভাগ প্রদর্শন করা হয়েছে।

১৩। কলহন লিখিত কাশ্মীরের ইতিহাস হল 'রাজতরঙ্গিনী'।

১৪। 'সখি, যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিষ্যদের শিক্ষাদানকালে একথা বলতেন।

১৫। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসি জাতির চরিত্রের মেরুদন্ড। 'জ্ঞানী, মুর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ রাজ্যশাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার'-এটি ফরাসি চরিত্রের মূলমন্ত্র।

১৬। লর্ড রবার্টসের গ্রন্থ - 'ভারতবর্ষের ৪১ বৎসর' বা 'Forty one years in India'।

১৭। শ্রী রাম প্রসাদ বলেছেন, 'ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল'।

১৮। পাদ্রী-পুঙ্গবেরা ১৮৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল।

১৯। 'তুলসী-যব জগমে আয়ো জগ হসে তুম রোয়। এয়সী করণী কর্ চলো কি তুম হসে জগ রোয়'-তুলসী দাসের দোঁহা।

২০। কালো বর্নের মানুষদের উদাহরন দিতে বিবেকানন্দ যে জায়গা গুলির উল্লেখ করেছেন-
কানাডা নিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ।
উত্তর মেরু সন্নিহিত দেশ নিবাসী এস্কিমো।

২১। আর সাদা বর্নের মানুষের বাস-বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ।

২২। আর্য বলতে লেখক যে জাতিগুলির উল্লেখ করেছেন - চীন, হূন, দরদ, পাহলব, যবন, খশ।

২৩। শাস্ত্রোক্ত চীন জাতি বর্তমানের 'চীনেম্যান' নয়। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বভাগে ছিল।

২৪। কলহন লিখিত কাশ্মীরের ইতিহাস হল - 'রাজ তরঙ্গিনী' এই গ্রন্থে দরদ্ রাজ্যের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

২৫। ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে হুন নামক প্রাচীন জাতি ছিল। এখন টিবেটিরা নিজেদের হুন বলে।

২৬। যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম, যবন নামটি 'যোনিয়া' নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়। পরে 'যোন' থেকে সংস্কৃত 'যবন' শব্দের উৎপত্তি।

২৭। শুধু হিন্দুরাই গ্রীকদের যবন বলত না, প্রাচীন মিসরি ও বাবলিরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত করত।

২৮। প্রাবন্ধিকের মতে ভারতীয় মেয়েদের শাড়ি আর পুরুষদের চোগা-চাপকান পাগড়ির সৌন্দর্য এ পৃথিবীতে তুলনা নেই।

২৯। মেয়েদের চঙ প্যারিস শহর থেকে বেরোয় আর পুরুষদের লন্ডন থেকে।

৩০। তৃতীয় ন্যাপলেঅঁ যখন ফরাসি দেশের বাদশা ছিলেন তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্টাত্রী দেবী ছিলেন।
৩১। রঙ-ঢঙ, ভোগ-বিলাসের ভূস্বর্গ প্যারিস, বিদ্যা শিল্পের কেন্দ্র প্যারিস।
৩২। ভারতীয়রা স্নান করে অধর্মের ভয়ে আর পাশ্চাত্যের মানুষেরা হাত মুখ ধোয় পরিস্কার হবে বলে। দক্ষিনীরা স্নান করে লম্বা চওড়া তিলক কাটে।
৩৩। হিন্দুরা ছেঁড়া ন্যাতায় মুড়ে কোহিনুর রাখে, বিলাতিরা সোনার বাক্সয় মাটির ভেলা রাখে।
৩৪। 'আহারা' শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্যের মতে -ইন্দ্রিয় লব্ধ বিষয় জ্ঞান।
৩৫। 'আহার' শব্দের অর্থ রামানুজাচার্যের মতে ভোজ্য দ্রব্য।
৩৬। রামানুজাচার্য ভোজ দ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলেছেন-
ক) জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত, যেমন পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়।
খ) আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যাক্তি বিশেষের স্পর্শ হতে আসে।
গ) নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট কেশাদি দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে।
৩৭। 'রামায়ণ', 'মহাভারত' এর নামও পাই আহার ও পানীয় তে।
৩৮। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুস্পাচ্য কচি কলাই শুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদু। এই ডালের সূপ প্যারিস রাজধানীর একটি বিখ্যাত খাওয়া।
৩৯। রামায়ণের উত্তরকান্ডে সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ চেয়েছেন।
৪০। ভাত প্রধান খাদ্য-বাঙলা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ উপকূলে, মালাবার উপকূলে।
৪১। পাশ্চাত্যদেশে গরিবদের প্রধান খাদ্য রুটি আর আলু।
৪২। স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা ওয়াইন অতি সস্তা এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ-মাংসের জায়গায় দ্রাক্ষারস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে।
৪৩। জার্মানরা পাঁচবার, ছবার খায় এবং প্রত্যেক বারেই অল্পবিস্তর মাংস।
৪৪। ইংরেজরা তিনবার খায় কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি যোগ, চা-যোগ আছে।
৪৫। আমেরিকানদের তিনবার উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর খায়।
৪৬। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকেরা খেতে বসার ধরন -
মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়।
বর্মি, জাপানি প্রভৃতি জাতিরা মানুষেরা উবু হয়ে বসে মাটিতে থালা রেখে খায়।
রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর বসে হাত দিয়ে খায়।
ইউরোপীয়রা টেবিলের ওপর থেকে কেদারায় বসে খায়।
৪৭। এস্কিমোরা ১০/৫ দিনে অরুচি বোধ হলে একটু করে পচা মাংস খায় তা রুচি সারে।
৪৮। ইহুদিরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শূকর খায় না, দেবতার উদ্দেশ্যে যা নিবেদিত তা খায় না।
৪৯। বাংলাদেশে, পাঞ্জাবে মাংসের নাম মহাপ্রসাদ।
৫০। আমেরিকানরা জল বেশি খায়। জার্মানরা বেশি 'বিয়র' পান করে।
৫১। কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্যন্ত বাঙালি বেহারী, প্রায়গী নেপালীর চেয়েও মনুর আইনের বিশেষ প্রচার।
৫২। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিরা পোশাকের দিক থেকে ফরাসীদের নকল করে।
৫৩। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে মদ্দরাও পাগড়ি পরত।
৫৪। প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদের পোশাক ছিল ধুতি চাদর, একযান বৃহৎ কাপড় ও চাদর এর নাম 'তোগা' এই 'তোগা'র অপভ্রংশ হল গেগা।
৫৫। চীনেরা সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের মুখস্বচ্ছন্দতার আদি গুরু।
৫৬। ফরাসী জলকে বলে ব্যাঙের রস।
৫৭। ভারতবর্ষের মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ, ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে এই সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে সমাজে।
৫৮। পাশ্চাত্যে 'ভাচু' আর আমাদের 'বীরত্ব' একই শব্দ।
৫৯। 'পা পাত্রি আ দাঁজে'- জন্মভূমি বিপদে।
৬০। জ্ঞান নামে হল বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা তখনও বলে বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা, সেই সম্বন্ধটাকে নিয়ম বলে, এরই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।
৬১। জম্বদ্বীপের মাঝখান থেকে সেলুজক তাতার নামক অসুর জাতি, মুসলমান ধর্ম গ্রহন করে আশিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে,
৬২। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান-মাংসে বিশেষ খুশি ছিলেন।
৬৩। 'আম-মাংস খেকো' মানে-কাঁচা বা আরাধা মাংসাহারী।

৬৪। ইউরোপীয় সভ্যতার উপায় তলওয়ার সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ পারলৌকিক ভোগ।
৬৫। আমরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস শস্যাদি উৎপন্ন করে শান্তিতে স্ত্রী-পরিবার পালন করতে পেলেই খুশি।
৬৬। ইউরোপের উদ্দেশ্যে সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব। আর্যদের উদ্দেশ্য চেয়ে বড় করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়-তলওয়ার, আর্যের উপায়-আর্বিভাগ, ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।
৬৭। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এই চতুবর্গের আদর্শে জীবনবোধের যে, সমগ্রতা দেখা যায়, বৌদ্ধ আদর্শে নির্বানের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে মানবজীবন ও জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ হ্রাস পেয়ে অতীন্দ্রিয় আদর্শের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

উদ্ধৃতি

১। 'ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালোটা তার করাই ভাল'।
২। 'মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়ে, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়'।
৩। 'সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমা: প্রজ্য'।
৪। জাতিধর্ম যদি ঠিক থাকে তো দেশের অধ:পতন হবেই না।
৫। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।
৬। 'গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈটি টিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি, কমবিন পহনে খাসা'।
৭। শক্তিমান পুরুষ যে পোশাকই পরুক বা কেন, লোকে মানে; আর আমার মতো আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।
৮। এত ওলাউটা এত মহামারী, ম্যালেরিয়া-কার দোষ, আমাদের দোষ, আমার মহা অনাচার।
৯। প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেই খানটা হতে যে জাতির রাজনীতি বিচার করতে হবে।
১০। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ: কিং কবিষ্যতি'।
১১। দুনিয়া সুদ্ধ লোক, তোমরা ওই, রাজা ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হোক, সকলে সমান হোক।
১২। 'আমরা এই মধ্যরেখায় দুর্দশায় এখন পড়ে'।
১৩। ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের।

teachinns Text with Technology

Sub Unit-4
বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি
নূতন কথা গড়া
বাঙ্গালা ভাষা
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৬০ সালের ২২ শে অগ্রাহায়ণ নৈহাটির বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন। ১৮৬৬ খ্রী: বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ির ছাত্রাবাসে আশ্রয় নিয়ে সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি স্নাতক স্তরে পাঠরত অবস্থায় 'ভারতমহিলা' নামক প্রবন্ধ রচনা করে 'হোলকার' পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল- 'প্রাচীন বাংলার গৌরব (১৩৫৩)', 'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৩৫৫), 'মেঘদূত' ব্যাখ্যা ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন চর্যাগীতি আবিস্কার করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বঙ্গীয় যুব ও তিন কবি উনিশ শতকে কোন যুবক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কলেজে ভর্ত্তি হলে ৪-৫ বছর ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত তিন ভাষায় সাহিত্য পাঠ করতে হত। চসার, স্পেনসার, শেক্সপিয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, ভবভুতি, বাল্মিকী, বেদব্যাস, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের গ্রন্থ পাঠ করতে হতো। বাঙালির চরিত্র গঠনে ও নীতিশিক্ষা দানে যাঁরা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন-বায়রন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে একমাত্র ইংরেজ সাহিত্যিক বায়রন বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র গঠনে সহায়ক। শেক্সপীয়রের নাটক সৎ অসৎ সকলকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু চরিত্রগঠনে কোনো ভূমিকা গ্রহন করে না। শেলির আদর্শবাদ এত উচ্চমার্গের তা অনুসরন করা কঠিন। চসার, স্পেনসারের লেখা কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠেনি। ডাইড্রেন, পোপের লেখা উপদেশাত্মক হলেও মনে দাগ কাটে না। বায়রনই একমাত্র পীড়িতের বন্ধু, পীড়দের শত্রু, যৌবন-দীপ্ত মহাতেজস্বী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, একমাত্র কালিদাসকেই বঙ্গীয় যুবকে চরিত্রগঠন প্রসঙ্গে স্মরন করেছেন। রামায়ন- মহাভারতের সৌভ্রাতৃত্ব ও পারিবারিক মূল্যবোধ সেকেলে বলে একালের বঙ্গীয় যুবকের কাছে অর্জিত। কালিদাস চরিত্র গঠনের উপদেশ দেননি। কিন্তু চরিত্রের যে আদর্শ তুলে ধরেছেন তা থেকে বঙ্গীয় যুবক চরিত্র গঠনের শিক্ষা অর্জন করেছে। বাংলা সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ বলে খ্যাত। বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত যুব সমাজকে ভিত্তি করে সাহিত্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। সুতরাং বঙ্গীয় যুবকদের চরিত্রগঠনে তিন মনীষী তাঁদের সাহিত্য সৃজনের মধ্য দিয়ে কিভাবে সহায়তা করেছেন, প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধে তা প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছেন।

teachinns
Teach with Technology

তথ্য

১। 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ, ১২৮৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
২। বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি প্রবন্ধটি ৪ টি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট।
৩। ভারতবর্ষে ইংরেজি বিদ্যা, শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান উন্নতি হবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদের চরিত্র নির্মান করে দিত।
৪। আজকের বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না
৫। বায়রন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র-তিনজন বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করেন।
৬। সকল বৃক্ষই সুমিষ্ট সকলেই আনন্দিত।
৭। মনুষ্য সমাজ বৃক্ষের পত্র।
৮। রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লেখা হয়েছিল তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এইজন্য রামায়ণই মহাভারতের উপদেশ সৌভাত্র ও পারিবারিক প্রেম।
৯। প্রাবন্ধিকের মতে, রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য রত্নদ্বয়ের মূলমন্ত্র মানুষের দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গনের দমন করে শান্তভাবে ধারন করানো।
১০। চসারের সেকেলে গল্প একেলে লোকের ভালই লাগে না।
১১। টেনিসনের উদ্দেশ্য পুরান জিনিস ভাল করে দেখানো।
১২। বায়রন হলেন পীড়িতের বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্টনয়ের আদার, যৌবন মূর্তিমান, মহা তেজস্বী সর্বদা চঞ্চল।
১৩। ইংরেজি সাহিত্যে বায়রনই বঙ্গীয় যুবকের চরিত্র নির্মাণের অংশী।

১৪। পোপ রচিত গ্রন্থ "An Essay On Criticism" (1711)।
১৫। ‘ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভালো হউক আর মন্দই হউক নিঙড়িয়া তিতা করিয়া দেন‘।
১৬। বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-বর্ননায় শুদ্ধ শান্তি হয়।
১৭। কালিদাসের লেখা এমন মধুর পড়ামাত্র মন আকৃষ্ট হয়।
১৮। বায়রনের বর্ননায় শান্তি নেই।
১৯। বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদের সমাজ।
২০। বায়রণের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু না কিছু উপদেশ আছে।
২১। বায়রণের মাঝে মাঝে Preehing ও আছে।
২২। বঙ্কিমবাবুর Preaching বড় উচ্চ।
২৩। বায়রণ অতি অশ্লীল কবি, যাঁরা এরূপ মনে করেন, তাঁদের বায়রন নীতি শিক্ষা দেননা।
২৪। বঙ্কিমবাবুর উদ্দেশ্য-স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ।
২৫। কালিদাসের উদ্দেশ্য- ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ।
২৬। বায়রনের উদ্দেশ্য-মনুষ্যানুরাগ ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ।

উদ্ধৃতি

১। ‘বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভালোবাসেন‘।
২। ‘মানুষের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও যত দেখিবে, তত জ্ঞান বাড়িবে, আনন্দ অধিক হইবে; এই আনন্দই আনন্দ, আর সব কেবল দু:খ আর অত্যাচার‘।
৩। ‘সবই কষ্ট-কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ‘।
৪। ‘বায়রনের একটি মানুষ সুখী নহে, তাহার মধ্যে মধ্যে অলৌকিক, অতি মানুষিক, হৃদয় প্রমাদক আনন্দ আছে বটে কিন্তু দু:খই সকলের স্বভাব সিদ্ধ‘।
৫। ‘বায়রনের সবই প্রলোভন, কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই‘।
৬। ‘বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরান হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায়‘।

teachinns Text with Technology

নূতন কথা গড়া
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভাষা ভাবকে প্রকাশ করে, বাংলা ভাষা মনের সমস্ত ভাব প্রকাশ করতে পারে না। বাঙ্গালি মনের সমস্ত ভাবকে প্রকাশের জন্য ত্রিবিধ কৌশল অবলম্বন করে-
ক) নূতন ভাব প্রকাশ করবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা।
খ) সেই ভাব প্রকাশে সক্ষম অন্য ভাষা থেকে শব্দ আমদানি করা।
গ) চলিত ভাষায় যেভাবে ভাব ব্যক্ত হয়, সেই ভাবেই তা প্রকাশ করা।
বোধগম্যতার উপর ভিত্তি করে এই তিনটি কৌশলের মধ্যে যেটি বেশি উপযোগী সেটিকেই প্রাবন্ধিক গ্রহন করার পক্ষপাতী। অনেকে বাংলা পড়েন না; কিন্তু বাংলা লেখেন। তারা খুশি মতো নতুন শব্দ তৈরি করে নেন, অথচ একটু সন্ধান করলে ভাব প্রকাশের উপযোগী বাংলা শব্দ তিনি পেতে পারতেন। পরিশেষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আলোচ্য প্রবন্ধে বলেছেন, বাংলা ভাষায় লিখতে, হলে, বাংলায় ভাবতে হবে। তাহলেই সেই ভাব, প্রকাশের উপযোগী শব্দ নিজে থেকেই চলে আসবে। তার জন্য অন্য ভাষার কাছে মাথা কুটে মরতে হবে না।

তথ্য

১। ‘নূতন কথা গড়া‘ প্রবন্ধটি ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ‘বঙ্গদর্শন‘ প্রকাশিত হয়।
২। বাংলা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করা যায় না।
৩। "Competition" শব্দের সংস্কৃত ধাতুপাঠ গত অর্থ- সংঘর্ষ।
৪। যা সহজেই ভেঙ্গে যায় তার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর।
৫। ভঙ্গপ্রবণ শব্দটি না বাংলা, না ইংরেজি, না সংস্কৃত।
৬। হিন্দি শব্দ ‘দুন‘ এর অর্থ ‘দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান‘ এটি বাংলায় নেই।
৭। উপত্যকা বলতে পর্বতের আসন্ন ভূমি বোঝায়।

৮। জ্যোর্তিবিদেরা যেখানে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি গননা করেন, তার নাম মানমন্দির বা তারাঘর কিন্তু অনেকে এটির ইংরেজি নাম Observator -র তরজমা করে নাম রেখেছেন পর্যবেক্ষনিকা।
৯। হিমালয় প্রদেশ কথাটি এসেছে ইংরেজির Himalayan Regions থেকে।
১০। It appointed a lecture এর তর্জমা বক্তা নিযুক্ত হয়েছে।
১১। এখন লেখকগনের মধ্যে সংস্কৃত পন্ডিত অতি বিরল।
১২। যে সর্বদা উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব ভাবে তার নাম ইংরেজিতে thoughtful বাংলা লেখকরা তার নাম রেখেছেন চিন্তাশীল।
১৩। নেবন্যাস বলতে সংস্কৃতে গচ্ছিত ধন বুঝায়।
১৪। 'ন্যাস' শব্দের সংস্কৃত অর্থ-গচ্ছিত ধন।
১৫। বিদ্যাসাগরেরর উল্লেখ রয়েছে প্রবন্ধে।
১৬। প্রাবন্ধিক পরামর্শ দিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত মনোমধ্যে ভাব ইংরেজিতে উদয় হয় ততদিন যেন কেউ বাংলা লিখতে না বসেন।

উদ্ধৃতি

১। 'উকিলিতে আজকাল বড়োই "competition"।
২। 'অধিকাংশ বাংলা লেখক বাংলা পড়েন না কেবল লেখেন'।
৩। 'বাংলা যে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা স্বতন্ত্র, জীবন স্বতন্ত্র, উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় এই তিনটি স্বতন্ত্র, এ কথা বর্তমান লিখিত বাংলা ভাষা দেখিলে কাহারো বোধগম্য হয় না'।

বাঙ্গালাভাষা
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঊনবিংশ শতকে বাংলা গদ্যের প্রারম্ভে বাংলা গদ্য গঠনের, নেপথ্যে যাঁদের অবদান আছে, সেই সমস্ত লেখদের প্রাবন্ধিক দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে, একদল যারা বাংলা ভাষা শেখেননি কিন্তু ইংরেজি পড়েছেন, লিখেছেন বাংলা। অপরদল বাংলা শেখেননি, পড়েছেন সংস্কৃত, লিখেছেন বাংলা। দুই শ্রেণীর লেখক কেউই শব্দভান্ডারের দিকে ফিরেও তাকাননি। সুতরাং অভিধান নির্ভর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও নূতন গড়া চোয়ালভাঙা শব্দ বাংলা গদ্যের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সেই সময় বাংলা ভাষায় দুটি প্রবনতা দেখা গিয়েছিল-
ক) সংস্কৃতায়নের প্রয়াসে সংস্কৃত শব্দ দ্বারা আরবি-ফরাসি শব্দ প্রতিস্থাপন।
খ) বিপরীত দিকে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখলেই অপাট্য বলে দাগিয়ে দেওয়া। এই টানাপোড়নে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। যাঁরা সঠিক বাংলা জানে না তারা বাংলা পুস্তক প্রনয়ন করার ফলে সেই পুস্তক যারা পাঠ করলেন তারা বাংলা শিখলে না। ফলে বাংলা ভাষীর কাছে বাংলা পুস্তক অবোধ্য ও অপাট্য বিবেচিত হল। এই পরিস্থিতিতে নব্য লেখক হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-বাংলা ভাষায় লিখতে হলে দুটি পথের কথা বলেছেন-
অ) ইংরেজি-বাংলা-পারসি-সংস্কৃতি মিশিয়ে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশনের ভদ্রসমাজ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষায় লেখা।
আ) যার যেমন ভাষা যোগায় সেই ভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা।

তথ্য

১। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবন সংখ্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
২। প্রাবন্ধিক 'বাঙ্গাল ভাষা' প্রবন্ধটি 'গ্রাজুএট' ছদ্মনামে লেখেন।
৩। মহাভারতের জনমেনজয় চরিত্রটির উল্লেখ আছে।
৪। বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসে'র উল্লেখ আছে।
৫। কিছু দিন পূর্বে বাংলা ভাষায় গদ্যগ্রন্থ ছিল না, কিন্তু পদ্য প্রচুর ছিল।
৬। কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগনের লেখা বিশুদ্ধ বাংলা।
৭। গদ্য না থাকলেও ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাকে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা বলে।
৮। আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিন প্রকার বাংলা ভাষা চালু ছিল।- ব্রাহ্মণ পন্ডিত, বিষয়ী লোক ও আদালতের লোক।
৯। যাঁরা বিষয়ী লোক তাঁদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত মেশানো থাকত।
১০। বিষয়ী লোকের যে বাংলা তাতেই পত্রাদি লিখিত হত।

১১। ‘কাদম্বরী‘র তর্জমা করেছিলেন তারাশঙ্কর তর্করত্ন (১৮৫৮ খ্রী:)
১২। বিদ্যাসাগর রচিত ‘জীবনচরিত‘(১৮৪৯) গ্রন্থের উল্লেখ আছে প্রবন্ধে।
১৩। অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়‘ প্রথমভাগ (১৮৭০ খ্রী:) - এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি উল্লিখিত হয়েছে ‘বাঙ্গালা ভাষা‘ প্রবন্ধে।
১৪। ‘বাঙ্গালা ভাষা‘ প্রবন্ধে ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন‘-এর উল্লেখ আছে।
১৫। ‘তখন সংস্কৃত কলেজ বাঙ্গালায় একঘরে‘- বাঙ্গালা ভাষা।

উদ্ধৃতি

১। ‘আমরা কলম ধরিলেই ইংরেজি কথায় ইংরেজি ভাব আইসে‘।
২। ‘আমরা ইংরেজি পড়ি আমাদের অর্ধেক ভাবনা ইংরেজিতে‘।
৩। ‘যাঁহারা এ পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাংলা ভাষা, ভালো করিয়া শিক্ষা করেন নাই‘।
৪। ‘বাংলা ভাষার পরিপুষ্টির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল‘।
৫। ‘যাঁহারা বাংলা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভালো বাংলা শিখেন নাই‘।
৬। ‘গ্রন্থাগারদিগের বাংলা বাংলা নহে‘।

teachinns Text with Technology

Sub Unit-5

সৌন্দর্যতত্ত্ব

সুখ না দুঃখ

অতিপ্রাকৃত-প্রথম প্রস্তাব

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

১২৭১ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র, মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগরতী তীরে চেঁয়া বৈদ্যপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চায় সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 'নবজীবন' (শ্রাবণ, ১২৯১) পত্রিকা প্রকাশের প্রথম বছরেই পৌষ সংখ্যায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম রচনা 'মহাশক্তি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এরপর 'নবজীবন' পত্রিকাতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ হতে থাকে 'বিবর্তন', 'মহাতরঙ্গ', 'সৃষ্টিতত্ত্ব' প্রভৃতি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রনীত গ্রন্থ সমূহ হল - 'প্রকৃতি' (১৮৯৬), 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬), 'কর্ম্মকথা' (১৯১৩), 'চরিতকথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' (১৯১৪), 'শব্দকথা' (১৯১৭), 'বিচিত্র জগৎ' প্রভৃতি।

সৌন্দর্যতত্ত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সৌন্দর্যের ধারণাটিকে তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেছেন এই প্রবন্ধে। সৌন্দর্যকে তিনি মনুষ্যত্বের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যে মানুষের সৌন্দর্য পিপাসা নেই, সে পরিপূর্ন মনুষ্যত্বের অধিকারী নয়। সুখ দুঃখের অনুভূতি যখন শিল্পে ও সাহিত্যে অভীব্যক্ত হয় তখন তা সুন্দর হয়ে ওঠে। তাকেই আমরা বলি আর্ট, যার বাংলা প্রতিশব্দ ললিত কলা। জ্যোৎস্না রাত্রে নিভন্ত চাঁদের আভা কোনো ব্যাক্তির কাছে মায়াময় আকার অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে স্মৃতির। তাই সৌন্দর্যের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা হয় না। নামহীন সৌন্দর্য। সংজ্ঞাহীনতার আখ্যায় ভূষিত। প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেগুলি হল-

১। সৌন্দর্য উপভোগ্যতার সঙ্গে মনুষ্যত্বের নিবিড় যোগ থাকে। ইতর জীবের সৌন্দর্যবৃদ্ধি থাকে না।
২। একঘেঁয়ে জিনিস সুন্দর হয় না।
৩। দুঃখের মধ্য দিয়েই মানুষকে সুখের সন্ধান করে।
৪। সৌন্দর্য সৃষ্টিতেই মানুষের আনন্দ।

তথ্য

১। 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ গ্রন্থের অর্ন্তগত প্রবন্ধগুলির হল 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'সুখ না দুঃখ', 'অতিপ্রাকৃত'-প্রথম প্রস্তাব; 'নিয়মের রাজত্ব' ইত্যাদি।
২। 'জিজ্ঞাসার' প্রকাশকাল ১৩১০ (১৬ ই মার্চ, ১৯০৪ খ্রি:) ফাল্গুন।
৩। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাগারে প্রকাশের পূর্বে 'বিবিধ মাসিক' পত্রে প্রকাশিত হয়।
৪। ডারউইন মতবাদীদের মতে - 'সৌন্দর্য বোধের সঙ্গে যৌনতার মূল আছে'।- এই উদাহরন স্বরূপ রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন যে ময়ূরীকে আকৃষ্ট করার জন্য ময়ূর তার পেখম বিস্তার করে নাচে। কাজেই সৌন্দর্যানুভূতির পশ্চাতে রয়েছে সৌন্দর্য বোধের utility।
৫। রামেন্দ্র সুন্দর সৌন্দর্য বলতে Fine Art কে বোঝাতে চেয়েছেন।
৬। তাঁর পরিণততম রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে -'বিচিত্র জগৎ' ও 'জগৎ কথা' গ্রন্থে।
৭। মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে সৌন্দর্য বোধ।
৮। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক সুখ দুঃখের সাথে সৌন্দর্য তৃষ্ণার প্রগাঢ় সম্পর্ক।
৯। নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্না স্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে অভিলাষ না জন্মায়, সে ব্যাক্তি নিতান্ত হতভাগ্য।
১০। মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার বারধৃত লীলাকমলের আঘাত পাবার জন্য স্বয়ং মধুকর স্থলবর্তীর থেকে কেউ বাসনা করে না।
১১। সুখ প্রাপ্তির ও দুঃখ পরিহারের অধ্যাবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বলা যায়, তবে সৌন্দর্য পিপাসা জীবনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।
১২। সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে বলে মানুষ উন্নত জীব।
১৩। ইংরেজিতে যাকে বলে আর্ট বাংলায় তাকে ললিত কলা।

১৪। সৌন্দর্য সৃষ্টি ও প্রকাশ তার অবলম্বন ও বিকাশ। মানব মনের যে যে ভাগের সাথে এর কারবার তার ইংরেজি নাম ইমথেটিক বৃত্তি। এই সৌন্দর্যই বর্তমানে বিষয়ীভূত।
১৫। সুন্দরের যা সৌন্দর্য, তা তার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম।
১৬। যিনি সৌন্দর্য ভোগ করবেন তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধির তীক্ষ্মতার উপরে সৌন্দর্যের মাত্রা নির্ভর করে।
১৭। পাখি, প্রজাপতি, ফুল-সূক্ষ্ম প্রকৃতির মানুষের অধিকাংশেরই নিকট সুন্দর বলে গৃহিত।
১৮। ডারুইনের মতে পুস্প দেহে আর প্রজাপতি দেহে বর্ন বৈচিত্র্য বিকাশের ব্যাখ্যার জন্য সৌন্দর্য অধিক আবশ্যক নয়।
১৯। সিগহের কেশর, পাখির কাকলি, ময়ূরের পুচ্ছ, এ সমস্তই, সুন্দর-ডারুইনের মতে এসব যৌন নির্বাচনের অভিব্যক্তি।
২০। অনুভূতির বৈচিত্র্য পরম্পরা নিয়েই চৈতন্য বা চিৎপ্রবাহ।
২১। যেখানে অনুভূতি নিত্য পরিবর্তনশীল, সেইখানে চৈতন্য স্ফূর্তিমান।
২২। যার মধ্যে চৈতন্যের প্রবাহকে স্থির বেগে মন্দগতিতে চালনা করে রাখে তাই সুন্দর।
২৩। যা আপাতত নিয়মের বাইরে তাকে মিরাক্কেল বলে।
২৪। প্রবন্ধটির প্রথম বাক্য : 'সৌন্দর্যবোধ মানবজীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত'।
২৫। প্রবন্ধটির শেষ বাক্য : 'যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলে এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে'।

উদ্ধৃতি

১। 'মনুষ্য মাত্রেরই জীবন-কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্ণার সফলতার বা নিস্ফলতার পরিচয় পাওয়া যায়'।
২। 'কতকগুলা প্রাকৃতশক্তি দেহের জীবনের স্থিতির পুষ্টির ও অভিব্যাক্তির অনুকূল, কতকগুলো প্রতিকূল'।
৩। 'আমার নিকট যাহা সুন্দর, তোমার কাছে হয়তো তাহা কুৎসিত'।
৪। 'যে কবির কাব্য আমার ভালো লাগে না, মরিলেও আমায় তাহা ভালো লাগিবে না'।
৫। 'মানুষের অনুভুতিগুলো একরকম নহে। পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতে যে দৃশ্যপট তাহা ক্ষনে ক্ষনে বদলাইয়া নূতন নূতন শব্দ, নূতন নূতন স্পর্শ, নূতন নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে'।
৬। 'জীবন, দু:খময়; কেন না, দু:খময় তাতেই জীবনের উন্নতি ও অবনতি'।

সুখ না দু:খ
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মানবজীবনের আনুভুতির অনুভব দুই-ই সুখ ও দু:খ। বলাবাহুল্য এক অপরের পরপূরক। সুখ এবং দু:খের সম্পর্ক যেন সীতাবিনা মনিহারা ফণি। ডারউইন অবশ্য বলেন, হিংসা এবং রক্তপাতই জীবনের উন্নতির সোপান, অস্তিত্বের স্মারকও বটে। সুতরাং জীবন দু:খময়। সুখ হল দু:খের সাময়িক অভাব মাত্র। শেপেন হাওয়ার দু:খবাদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। দার্শনিকদের মতে মুক্তি বা নির্বান আসলে দু:খময় জীবন থেকে মুক্তির প্রয়াস। যাতে পৃথিবীতে বারে বারে জন্মগ্রহণ করে অনন্ত দু:খ ভোগ করতে বা হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'প্রথম' এবং 'দ্বিতীয়'-একে অপরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এক অপরের বিপক্ষে যুক্তি প্রস্তুত করেছেন। নিজস্ব অভিমত দিয়ে কোন পক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পাননি। কারন আবহমান কালের 'নিহিত পাতাল রহস্যে' সুখ এবং দু:খ ওতো:প্রতো ভাবে জড়িয়ে। তাকে দিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায়, কল্পনা করা যায়, ধর্ম ও অধর্মের ভেদাভেদ আনা যায়। পৃথিবীর অতলভূমির সঙ্গে প্রকৃতি যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তেমনি মানবজীবনে থাকে সুখ-দু:খ। তাই মীমাংসা হল না। প্রকৃতির উপদেশ রইল বৈরাগী না হওয়ার।

তথ্য

১। প্রকাশ: 'সাধনা' মাঘ ১২৯৯
২। প্রবন্ধটির প্রথম লাইন: 'মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দু:খকে পরিহার করবার জন্য সর্বতোভাবে যত্নশীল'।
৩। প্রবন্ধের শেষ লাইন: 'মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই-দিক দেখাইয়া গিয়ে লেখক যদি অজ্ঞাত সারে কোনো দিকে বেশি টান দিয়া যাবেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন'।
৪। ইতর প্রাণীরা সুখের চেষ্টায় জীবন প্রবাহিত করে।
৫। অভিব্যক্তির পাঁচটা কারন।
৬। 'জীবনে সুখ অধিক, জীবনের অস্তিত্বই তাহার প্রমান'।
৭। সুখ অন্বেষনের নাম জীবন প্রয়াস।

৮। প্রথম পক্ষের মতানুসারে জীবনে সুখ অনেক, জীবনের অস্তিত্বই তা প্রমাণ করে দেয়। সুখের মাত্রা অধিক না হলে মানুষ বাঁচে না।
৯। দু:খের ক্ষয় এবং সুখের বর্দ্ধন অভিব্যক্তির মর্ম ও উদ্দেশ্য।
১০। হার্বাট স্পেনসার একালের অভিব্যক্তিবাদের প্রধান 'পান্ডা'।
১১। ডারউইন তত্ত্বের অনন্যতর প্রচারক আলফ্রেড ওয়ালায।
১২। দু:খ থেকে মুক্তির চেষ্টাই অভিব্যক্তি।
১৩। দারিদ্রকে দু:খ বলে।
১৪। ধার্ম্মিক যেখানে দুটো অধার্ম্মিক সেখানে দু-দশটা।
১৫। মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই কামনা বা আকাঙ্খা।
১৬। আকাঙ্খা নিয়েই জীবনের কাজ: বুদ্ধি ও চিন্তা ছাড়াও মানসিক বৃত্তি কামনারই ভরনপোষণ ও পরিচর্যাকার্যে নিযুক্ত।
১৭। যে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক এর দু:খ ভোগের শক্তি অধিক তার দু:খও বেশি।
১৮। যার চেতনা নেই তার দু:খ নেই।
১৯। নিকৃষ্ট জীবের তুলনায় উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর।
২০। যেখানে উন্নতি বেশি সেখানে দু:খ বেশী।
২১। দু:খানুভব শক্তি বিকাশের নামই উন্নতির বা অভিব্যক্তি।
২২। দু:খবাদীদের মধ্যে শোপেন হাওয়ার ও হাম্যোন অগ্রণী।
২৩। জার্মানিতে দু:খবাদের প্রার্দুভাব ঘটেছে।
২৪। এদেশের দার্শনিকবাদের দু:খের জীবন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্খার ফল-মুক্তিবাদ বা নির্বাণবাদ।
২৫। কালিদাস সুখ ও সৌন্দর্য ভোগ করে ছিলেন।
২৬। রামায়ন মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দু:খ-সংগীত। তবে বৈরাগ্য অবলম্বন এর উপদেশ নয়।
২৭। জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন উৎসর্গ করা হয়।
২৮। প্রকৃতির উপদেশ হল - বৈরাগী না হওয়া এবং ভালো ছেলে হওয়া।

উদ্ধৃতি

১। 'যদিও আবহমান কাল ধরিয়া মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষনেরই নাম জীবন প্রয়াস, তথাপি মানুষের জীবনে সুখের ভাব অধিক, কি দু:খের ভাব অধিক, তাহা এখনও স্থির হয় নাই'।
২। 'যাহা, সমাজের পক্ষে মোটের ওপর সুখপ্রদ, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা দু:খপ্রদ মোটের ওপর তাহাই অধর্ম্ম।
৩। 'সুখ যত স্থায়ী হয় তত কমে, দু:খ যত থাকে তত বাড়ে। এমনকি অতিরিক্ত সুখই দু:খ হইয়া দাঁড়ায়; দু:খকে সুখ হইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক-হিংসা ঈর্ষা পরিতাপ সবই দু:খময়; যৌবন স্বাধীনতা, দু:খের তাৎকালীন অভাব মাত্র। অনুভূতির তীক্ষ্মতা জন্মাইয়া দু:খ ভোগের সুবিধা করিয়া দেয়।

অতিপ্রাকৃত (প্রথম প্রস্তাব)
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কারন, তা বংশ পরম্পরা আজন্ম সংস্কারে পর্যবসিত। তখনই মানব মনে অতিপ্রাকৃতের জন্ম হয়। অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাস হল মানুষের অর্জিত। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সেই সংস্কারকে বর্জন করতে পারলে তবেই মানুষ অতিপ্রাকৃতের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর অতিপ্রাকৃত: প্রথম প্রস্তাব- প্রবন্ধে অতিপ্রাকৃত-এর অর্থ বুঝিয়েছেন 'সীমা থেকে অসীম, সঙ্কীর্নতা থেকে বিস্তীর্ণতায়-মানুষের জ্ঞান এবং চেতনার আধার যখন উপপল্লবিত হয় তখন সৃষ্টি হয় অতিপ্রাকৃতের কোন ঘটনায় প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে নয়। অভিজ্ঞতা নতুন হলেই তা অতিপ্রাকৃত হতে পারে না। মানুষ যতক্ষণ না তার রহস্য ভেদ করতে না পারবে ততক্ষণ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস লুপ্ত হবে না, প্রাকৃতে সঙ্গে তা মিলে মিশেই থাকবে।

তথ্য

১। মানুষের চরিত্র রহস্যময়।
২। কোন কোন বড় লোক অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস করেন। মানবজাতির এই বিশ্বাস প্রবলভাবে প্রচলিত।
৩। মনুষ্যজাতির এই বিশ্বাস প্রকৃতিগত কিংবা স্বভাবসিদ্ধি-এ বিষয়ে সন্দেহ।
৪। 'ভূত' মানতে নৈতিক সাহসে কুলায় না।

৫। মুখ যখন ভূত কে মানতে চায় না। মন তখন ভিতরে ভিতরে হাসতে থাকে।
৬। অতি প্রাকৃতকে বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।
৭। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী যাঁরা তারা নানা ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছেন।
৮। জ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটা তত কমে আসছে।
৯। প্রাকৃত শব্দের অর্থ যা প্রকৃতি নির্দিষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত।
১০। অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ যা প্রকৃতির নিয়মিত বিধানের বাইরে।
১১। অনভিজ্ঞতার জোরে আমরা সত্য ঘটনাকে অলীক বলে উড়িয়ে দিতে চাই।
১২। সেকালে মানুষ ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প, চন্দ্রগ্রহন প্রভৃতি ঘটনাকে নৈসর্গিক বলে মনে করতেন।
১৩। হিপনটিজম বা বশীকরণ।
১৪। ইদানীং আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মে অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অজ্ঞতার পরিমান অধিক।
১৫। প্রকৃতি যদি বিশ্বব্যাপী হয়। তাই হলে বিশ্বব্যাপী জগতের কোনো কিছু ঘটছে সকলই প্রাকৃত; অতিপ্রাকৃত ঘটনা হতে পারে না;

উদ্ধৃতি

১। ‘সময়ে অসময়ে, বিজন আঁধারে এই আগ্রহ মৌখিক অবিশ্বাসো মুক্তির আচ্ছাদন ছিন্ন করিয়া হৃৎবাস্প, প্রভৃতি দৈহিক-ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকট করিয়া ফেলে‘।
২। ‘অমুক অমুক ঘটনা এত দূর অবিশ্বাস্য যে, মনকে নিতান্ত বলপূর্বক না টানিলে মন সেদিকে ধায় না; তথাপি আমার অপেক্ষা, সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধিমান ব্যাক্তি সেই ঘটনা নির্বিবাদে বিশ্বাস করিতেছেন। তখন কতটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইতে হয়।
৩। ‘প্রকৃতি যদি বিশ্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপী জগতের যেখানে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই প্রাকৃত; অতিপ্রাকৃত ঘটনা হইতে পারে না‘।

নিয়মের রাজত্ব
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিশ্বজগতে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাই নিয়মের অধীন। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারনে সমস্ত পার্থিব বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা কোন না কোন নিয়মে বাঁধা। বেলুন উপরের দিকে ওঠে জাহাজ জলে ভাসে সমস্ত ঘটনার রামেন্দ্রসুন্দর ধরে ধরে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যেকটি বস্তুর নির্দিষ্ট ভার বা ওজন আছে যা নিম্নমুখী। যদি উর্ধ্বমুখী চাপ নিম্নমুখী, বলের তুলনায় বেশি হয় তবে বস্তুটি উপরে উঠে যাবে। এই বস্তুকে প্রাবন্ধিক ‘লঘু বস্তু‘ বলেছেন। আর, যদি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল উর্ধ্বমুখী চাপ, অপেক্ষা বস্তুর ভার বেশী হয়, তবে বস্তুটি নিম্নগামী হবে। এই নিয়মের বলেই নারিকেল গাছ থেকে ভূমিতে পড়ে। তবে যেখানে নিম্নগামী বল ও উর্ধ্বগামী চাপ সমান হবে, সেখানে বস্তুটি ‘ন, যবো ন তস্থৌ‘ অর্থাৎ নামবেত্ত না উটবেত্ত না। একই জায়গায় স্থির থাকবে। মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী মহাবিশ্বের যে কোন দুটি বস্তুকণা পরস্পরকে আকর্ষন করেও কাছাকাছি আসতে পারে না। কারন অন্য বস্তুর বিপরীত মুখী আকষর্নে তা ‘ন যযো ন তস্থৌ‘ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্রহ, নক্ষত্র, সৌরমন্ডল এই নিয়মেই নিজস্ব কক্ষপথে বিরাজ করছে।
১। মানুষের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে।
২। বিজ্ঞানসম্মত যে কোনো গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাবে, লেখা আছে- প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের কোনো অস্তিত্ব নেই, সর্বত্রই নিয়ম এবং শৃঙ্খলা।
৩। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রভিমুখে গমন করিতে চায়।
৪। লোহা গুরু দ্রব্য কিন্তু একটু পারার মধ্যে ফেললে লোহা ডোবে না। ভাসতে থাকে।
৫। শোলা লঘু দ্রব্য, কিন্তু জল থেকে উর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করলে সুরে ভূতলগামী হয়।
৬। পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব যে পৃথিবীর দিকে আসতে চায়।

উদ্ধৃতি

১। ‘পার্থিব দ্রব্য মাত্রই, ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে, এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ‘।
২। ‘মানুষের রাজ্যে আইন আছে বটে, সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে‘।
৩। ‘খাঁটি নারিকেল নিয়মভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেন পূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়মভঙ্গ করিতে পারে‘।
৪। ‘গরু দ্রব্য, নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম‘।

Sub Unit-6

ভারতচন্দ্র
বইপড়া
মালট সমালোচনা
সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা
কাব্যে অশ্লীলতা-আলঙ্কারিক মত
প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

বাংলাদেশের পাবনা জেলার অর্ন্তগত হরিপুর গ্রামে ১৮৬৮ খ্রী: ৭ আগষ্ট প্রমথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী, মাতার নাম মগ্নময়ী। 'সবুজপত্র' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রমথ চৌধুরী ফরাসী প্রাবন্ধিক মঁতেনের অণুগামী। ব্যাক্তিসচেতনতায় উদ্ভাসিত মননশীল যুক্তিনিষ্ট পরিচ্ছন্নরূপের আদি স্রষ্টা প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল -

১) তেল-নুন-লকড়ি (১৯০৬)
২) বীরবলের হালখাতা (১৯১৭)
৩) নানাকথা (১৯১৯৬)
৪) আমাদের শিক্ষা (১৯২০)
৫) দু-ইয়ারি কথা (১৯২০)
৬) বীরবলের টিপ্পনী (১৯২১)
৭) রায়তের কথা (১৯২৬)
৮) নানাচর্চা (১৯৩২)
৯) ঘরে বাইরে (১৯৩৬)
১০) প্রাচীন হিন্দুস্থান (১৯৪০)
১১) বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৯৪৪)
১২) হিন্দুসঙ্গীত (১৯৪৫)
১৩) প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য হিন্দু মুসলমান (১৯৫৩)
১৪) প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খন্ড ১৯৫২ এবং ২য় খন্ড ১৯৫৪)

teachinns Text with Technology

ভারতচন্দ্র
প্রমথ চৌধুরী

সম্প্রতি কালের কোন লেখক সমালোচক প্রমথ চৌধুরীকে এ যুগের ভারতচন্দ্র অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর বলেছিলেন। এরই নিরিখে প্রমথ চৌধুরী আত্মকথন রীতিতে গুরুগম্ভীর বিষয়কে শ্লেষ ও সরসতায় উপভোগ্য রূপে উপস্থাপন করেছেন 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটিকে তিনি ভারতচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে তিনি প্রাবন্ধিকের তুলনায় কত বড় শিল্পী এবং এ তুলনার অসারতা। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর একশ আশি বছর পরেও তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতচন্দ্রের মতো প্রমথ চৌধুরীও উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন এখানেই তাঁদের মিল। ভাষামার্গে প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করার কথা স্বীকার করেছেন। ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ প্রমথ চৌধুরী খন্ডন করেছেন। সাহিত্যে আদিরসের বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্য ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার মধ্যে আর্ট আছে। অলংকার ও ভাষার চাতুর্যে ভারতচন্দ্র আতকে আবৃত রূপে প্রকাশ করেছেন। প্রাবন্ধিক তাই আদিরস নয়, হাস্যরসকেই ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস বলে মন্তব্য করেছেন। প্রধান রস বলে মন্তব্য করেছেন।

তথ্য

১। ‘ভারতচন্দ্র‘ প্রবন্ধটি প্রথমে ‘মানসী’ ও ‘মর্মবাণী’ পত্রিকার শ্রাবন ১৩৩৫ সংখ্যায়ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।
২। ‘ভারতচন্দ্র‘ প্রবন্ধটি প্রথমে ‘নানাচর্চা‘ গ্রন্থে পরে ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ‘ -এ অর্ন্তভুক্ত হয়।
৩। ‘ভারতচন্দ্র‘ প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরী শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ রূপে পাঠ করেন।
৪। "The Spirit is willing, but the flesh is weak"-ভারতচন্দ্রের প্রবন্ধের অংশ।
৫। ‘ভারতচন্দ্র‘ প্রবন্ধে কোনো সমালোচক প্রাবন্ধিককে নিন্দা কিংবা প্রশংসা ছলে ‘এ যুগের ভারতচন্দ্র‘ অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর অভিধায় ভূষিত করেন।
৬। প্রাবন্ধিকের মত অনুসারে এ যুগের সাহিত্যিকদের কর্তব্য হল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রণোদিত সমালোচকদের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করা।
৭। প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস, বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।
৮। ভারতচন্দ্র প্রবন্ধটির ১৪ টি অনুচ্ছেদ আছে।
৯। ১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক ব্যাক্তি ‘কবির জীবনী সম্বলিত‘ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন।
১০। ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন, তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে এবং তা হবে রসালো।
১১। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস।
১২। ১৭১২ খ্রী: ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অর্ন্তগত পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
১৩। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ৪৮ বৎসর বয়সে মূলাজোড় গ্রামে।
১৪। ভারতচন্দ্রের শেষ বয়সের কটা দিন কিভাবে কেটেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত ‘নাগাষ্টক‘ গ্রন্থে।
১৫। ভারতচন্দ্রের জীবনীকার ঈশ্বরগুপ্ত।
১৬। ভারতচন্দ্র জাতকবি।
১৭। প্রাবন্ধিক দার্জিলিং শহরে একটি সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে, ইংরেজি ভাষার একটি কবিতা পাট করেন।
১৮। এই পাঠ করা কবিতাটি অবলম্বনে প্রাবন্ধিক ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, সেখানে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের দোষগুনের বিচার করেন।

teachinns Text with Technology

উদ্ধৃতি

১। ‘যর্থাথ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নিলিপ্ত, কম্মিনকালে বিষয় বাসনায় আবদ্ধ নয়।
২। ‘অহং ও আত্মা এক বস্তু নয়‘।
৩। ‘ভারতচন্দ্র ছোটো হন বড় হন‘- জাতকবি।
৪। ‘সাহিত্যের রস এক নয়, বহু এবং বিচিত্র‘।
৫। ‘প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ‘।
৬। ‘ভাষা ছাড়া ভাব নেই‘।
৭। ‘যা আমরা ভাষার গুন বলি তা হচ্ছে মনের গুনের প্রকাশ মাত্র‘।
৮। ‘হাসি জিনিসটাই অশিষ্ট, কারন তা সামাজিক শিষ্টাচারের বর্হিভূত‘।
৯। ‘সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি‘।

বইপড়া

প্রমথ চৌধুরী

প্রাবন্ধিক ‘বইপড়া‘ প্রবন্ধে গ্রন্থ পাঠের উপর জোর দিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতি ‘সাহিত্য‘ পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে ‘উদাসীন গ্রন্থকীট‘ বলে অভিহিত করেছেন। সেকালের বিশেষত হিন্দুযুগে নাগরিকদের বড় পড়ার একটা ফ্যাশন ছিল। সেসময় নানাবিধ বিলাসী দ্রব্যের ন্যায় কোন ক্লাসিক পুস্তক শয়ন গৃহে সুসজ্জিত করে রাখা হত। যতটা না পড়বার জন্য, তার চেয়ে বেশি দেখবার জন্য। সেকালে কালচার হল নাগরিকদের প্রধান গুন। নাগরিক সমাজে প্রতিপত্তি লাভের পাথেয়। সাহিত্য মানুষের ভালো করুক বা না করুক, মানুষকে সভ্য করে। মৃচ্ছকটিক নাটকের দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, শকার ও বিট উভয়েই বিলাসভক্ত কিন্তু শকার আচরনে ও ব্যবহারে পশু আর বিট সৌজন্যে, আভিজাতে সভ্য, সুতরাং নাগরিকদের কাব্যচর্চা ব্যর্থ হয়নি। সাহিত্যচর্চা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, সুতরাং সাহিত্যচর্চা করতেই হবে। তাই বই পড়া

আবশ্যক। সিলেবাস ভিত্তিক বই নয়। লাইব্রেরি হচ্ছে মনের হাসপাতাল। স্কুল, কলেজ, শিক্ষার্থীকে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ দেয় না। লাইব্রেরি আমাদের সেই সুযোগ করে দেয়।

তথ্য

১। 'বইপড়া' প্রবন্ধটই 'সবুজ পত্র' পত্রিকার শ্রাবন, ১৩২৫ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।
২। 'আমাদের শিক্ষা' গ্রন্থে ও আরও পরে 'প্রবন্ধ সংগ্রহে'-এ গৃহীত হয়।
৩। প্রমথ চৌধুরী কটেজ লাইব্রেরি ও ভবানীপুর ইন্সটিউটের, সাহিত্য শাখার অধিবেশনে প্রবন্ধটি পাঠ করেন।
৪। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন- অতিরিক্ত চা পানের ফলে মানুষের যেমন আহারে অরুচি হয়, অতিরিক্ত সংবাদপত্র পাঠের ফলে মানুষের তেমনি সাহিত্যে অরুচি হয়।
৫। নাগরিক বলতে সেকালে সেই শ্রেণীর জীব বোঝাতে যাদের একালে ইংরেজিতে বলে - Man About Town।
৬। প্যারিসের নাগরিকরা আনাতোল ফাঁস-এর বই পড়িনি বলতে লজ্জাবোধ করেন।
৭। পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুন।
৮। চরিত্রহীন অথচ কলা কুশল নাগরিকদের সেকেলের সাধারণ সংজ্ঞা হল 'বিট'।
৯। 'বিট' এর ছবি দেখা যায় 'মুচ্ছকটি' এ।
১০। সেকালের সভ্যতা ছিল - অ্যারিস্টোক্রাসিক'।
১১। একালের সভ্যতা চায় - ডেমোক্রাটিক।
১২। যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি জ্ঞানে বড় নয়।
১৩। প্রাবন্ধিকের মতে, লাইব্রেরির মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে।
১৪। প্রাবন্ধিকের মতে গ্রীক সাহিত্যে, আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনো বিচ্ছেদ নেই।
১৫। ঐতিহাসিক হতে গেলে যে গুণ থাকা দরকার -
ক) বর্তমানের প্রতি উদাসীন হওয়া।
খ) প্রাচীন গ্রন্থের কীট হওয়া চাই।
১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরীর গদ্যকে বলেছিলেন - 'হস্তাপের ছুরি'।

উদ্ধৃতি

১। 'যে জাতির যত বেশি লোক বই পড়ে, সে জাতি তত সভ্য'।
২। 'পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ'।
৩। 'এ যুগের সাহিত্য মাত্রেই রোমান্টিক, অর্থাৎ তাতে আর্টের ভাগ কম এবং আত্মার ভাগ বেশি'।
৪। 'সেকালে বই পড়াটা ছিল বিলাসের অঙ্গ'।
৫। 'যে সমাজে আয়েসির দলও কাব্য কলার আদর করে, সে সমাজ আভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে'।
৬। 'পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান করলেও রুচিমান করত'।
৭। 'যে জাতি মনে বড়ো নয়, সে জাতি জ্ঞানেও বড় নয়'।
৮। 'মানুষের মনকে সবল, সচল, সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যাস্ত'।
৯। 'সুশিক্ষিত লোকমাত্রেই স্বশিক্ষিত'।
১০। 'যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব'।
১১। 'আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে'।
১২। 'লাইব্রেরির মধ্যে আমাদের জাত মানুষ হবে'।

মলাট সমালোচনা
প্রমথ চৌধুরী

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী লেখক ও সমালোচকদের অতিভাষণের সমালোচনা করেছেন। অতি নিন্দা বা বাড়াবাড়ি ধরনের প্রশংসা সত্যকে গোপন করে বিজ্ঞাপনের রূপ ধারন করে। ঔষধ দোকানে লাল-নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি নানা রঙের কাঁচের শিশিতে ওষুধের মতো পুস্তকের দোকানে পুস্তক-পুস্তিকাগুলি নানারূপ বর্ণচ্ছটায় নিজেদের প্রকাশ করে। পুস্তকের মলাটের মধ্যে ও আছে বিজ্ঞাপনের ছায়া। পুস্তকের মলাট বা প্রচ্ছদ বিচিত্র রঙের কারিকুরিতে এমনভাবে আঁকা হয়, যা সহজেই পাঠকের মন ভোলায়। প্রাবন্ধিকের এই প্রয়াসকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে। লেখকের কৃতিত্ব মলাটে ঢাকা পড়ে যায়।

মলাটের এই অতিরঞ্জিত রূপ পাঠকের কাছে আর পাঠ্য, শ্রাব্য, কোনোটাই থাকে না, মলাটের সঙ্গে ভেতরের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

তথ্য

১। 'মলাট সমালোচনা' প্রবন্ধটি 'সাহিত্য' পত্রিকার অগ্রহায়ন, ১৩১৯ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
২। 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থে ও আরও পরে 'মলাট সমালোচনা' প্রবন্ধটি গৃহিত হয়।
৩। ইংরেজি ভাষায় প্রবাদ-প্রাচীরের কান আছে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে।
৪। প্রাবন্ধিকদের মতে, যে উপায়ে পেটেন্ট ঈষৎ বিক্রি করা হয় সেই উপায়ে সাহিত্যও বাজারে বিক্রি করা হয়।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আলোচনা' নামক বই এর উল্লেখ আছে।
৬। আলোচনা শব্দের অর্থ- 'আ' অর্থাৎ বিশেষরূপে, 'লোচন' অর্থাৎ ঈক্ষন।
৭। প্রমথ চৌধুরীর মতে 'বঙ্কিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু কম ছিল না'।
৮। 'শ্রী যুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল জাত কবি'।
৯। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' নামক পুস্তকের নামটিতে প্রাবন্ধিকের খটকা লেগেছিল।
১০। প্রাচীন গাথার ভাষায় 'এষা' র অর্থ 'অন্বেষণ'।
১১। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তকগুলির নামকরন প্রাবন্ধিককে বিস্মিত করে।

উদ্ধৃতি

১। 'নিন্দুকের চাইতে সমাজে চাটুকারের মর্যাদা অনেক বেশী'।
২। 'অতিনিন্দা এবং অতি প্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য'।
৩। 'সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মূর্তি ধারণ করেছে'।
৪। 'মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের বল এবং মানবমনের সরল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত'।
৫। 'বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের মন ও নয়ন আকর্ষন করা'।
৬। 'বাড়াবাড়ি জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচায়ক'।
৭। 'বইয়ের মলাটে এই রূপ অতিরঞ্জিত রূপ শীঘ্রই সকলের পক্ষেই অরুচিকর হয়ে উঠবে'।
৮। 'ভাষা জিনিসটা কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির মনগড়া নয়, যুগযুগান্তর ধরে একটি জাতের হাতে গড়া'।

teachinns Text with Technology

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা
প্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' প্রবন্ধে সাধুভাষা ও চলিতভাষা কোনটি সাহিত্যে প্রয়োজনীয় সেই সম্পর্কে কিছু কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমস্যাটা কি। প্রমথ চৌধুরী সমাধানটা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে নিজস্ব, অভিমত দান করেছেন। 'সাধুভাষা আর্টের অনুকূল'। ললিতকুমারের এই মন্তব্যে নিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন সাধুভাষা হল, কৃত্রিম ভাষা। এই ভাষার সরলতা ও স্পষ্টতা, সঞ্চার করা সহজ নয়। ললিত কুমার পন্ডিতি বাংলাকে বর্জনের পক্ষপাতী কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ভাষার বিবর্তন পন্থী। ইংরেজি বাক্যের গঠনরীতিকে অনুসরণ করে অনেকে খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করেছেন। এই ভাষার হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। তাই তিনি কৃত্রিম ভাষাকে ছেড়ে মৌখিক ভাষাকে অবলম্বন করতে বলেছেন। পরিশেষে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের ব্যবহার, বিপরীতে যথেচ্ছভাবে আরবি-ফারসি ভাষা থেকে শব্দগ্রহন এই উভয় প্রবনতাকে প্রাবন্ধিক বর্জনের কথা বলেছেন।

তথ্য

১। ১৩১৯ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় চৈত্র মাসে 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
২। 'নানা কথা' গ্রন্থে আরও পরে প্রবন্ধ সংগ্রহে 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধটি গৃহিত হয়।
৩। 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' নামক প্রবন্ধটির লেখক হলেন শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম.এ।
৩। ললিতবাবু সাধুভাষার সপক্ষে যে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন -
ক) সাধুভাষা আর্টের অনুকূল।
খ) চলিত ভাষার অপেক্ষা সাধুভাষা হিন্দুস্থানি মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভিন্নজাতিয় লোকদের নিকট অধিক সহজবোদ্য।

৪। 'ডাঙায় বাঘ জলে কুমির'- প্রবাদটির উল্লেখ রয়েছে প্রবন্ধে।
৫। 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের প্রধান আপত্তি ও রূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনো স্থান নেই।
৬। প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম গদ্য লেখক হিসাবে রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করেছেন।
৭। অন্বয় গুণেই বিদ্যাসাগরের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।
৮। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষা শব্দ ত্রিবিধ। যথা- তজ্জ, তৎসম, দেশী।
৯। 'রচনার প্রধানগুন, এবং প্রথম আয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা'- লেখায় সেই গুণটি আনবার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার।

উদ্ধৃতি

১। 'সাধুভাষা আর্টের অনুকূল'।
২। 'আর্টহীন লেখা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে কৃতকার্য হয় না'।
৩। 'কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোন স্থান নেই'।
৪। 'ল্যাটিন ভাষার সহিত ফরাসি ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষারও ঠিক একইরূপ সম্বন্ধ'।

কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত
প্রমথ চৌধুরী

প্রাবন্ধিক বহু বিত্রকিত এই বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের অভিমত বিচার বিশ্লেষনের প্রয়াস পেয়েছেন। অশ্লীলতা কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ সে বিষয়ে সংস্কৃত আলংকারিকরা সকলেই একমত। অশ্লীলতা কাব্য দেহের শোভা বৃদ্ধি করে না, ফলে তা রসের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। অশ্লীলতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বামন বলেছেন - 'ব্রীড়াজুগপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী' অর্থাৎ যে বাক্য শুনে লজ্জা, ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা হয় তাই অশ্লীল, পাঠকের তা রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়। তবে কালভেদে ও ব্যক্তিভেদে এর আবেদন ভিন্ন ভিন্ন হয়। অর্থাৎ পাঠকের রুচিই হল কাব্যের শ্লীলতা-অশ্লীলতার কষ্টিপাথর।

তথ্য

১। 'কাব্যে অশ্লীলতা ও আলংকারিক 'মত' প্রবন্ধটি মাসিক বসুমতীতে বৈশাখ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।
২। প্রবন্ধটি ১১ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।
৩। 'সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান গুণ তার শ্লীলতা নয়'।
৪। 'শ্লীলতা-অশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনিতীর কথা নয়'।
৫। 'কামং সর্বোহ প্যলংকারো রসমর্থে নিস্কতি, তথাপ্যগ্রাম্য তৈবেনং ভারং বহতি ভূয়সা'- দন্ডীর কাব্যাদর্শ।
৬। 'আমরা অশ্লীল বলতে যা বুঝি, দন্ডী গ্রাম্য বলতে তাই যে বুঝতেন তার প্রমাণ তাঁর উদাহৃত কোনো কোনো শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই পাওয়া যায়'।
৭। 'আলংকারিকদের মতে যা রসের প্রতিবন্ধক তাই দোষ'।
৮। 'যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃনা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল'।
৯। 'অশ্লীলতা কাব্যের দোষ, কেননা তা সামাজিক লোকের রুচিতে বেসাপ্পা টেকে'।
১০। ফরাসি রুচি ইংরেজদের রুচির সঙ্গে মেলে না।
১১। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' তে প্রমান করেছেন যে সমাজের মনে কাব্য জিজ্ঞাসা নেই সেই সমাজ কখনও কাব্য মীমাংসায় উপনীত হতে পারে না।
১২। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে আবিস্কৃত নতুন কথা 'সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা'।
১৩। বামনের কথাই হল অশ্লীলতা সম্পর্কে আলংকারিকদের শেষ কথা।
১৪। আনাতোঁল, ফ্রাঁসের কথা ইংরেজের রুচিতে অশ্লীল টেকলেও ফরাসীদের রুচিতে নয়।
১৫। বিংশ শতাব্দীর একজন ইংরেজ ওরিয়েন্টালিস্ট হলেন কীথ।
১৬। 'গ্রাম্যতা অবশ্য শব্দরেও দোষ, অর্থেরও দোষ'।
১৭। 'সকল সমাজের লোক সমান কাব্যরসিক নয়'।
১৮। 'অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যে যথেষ্ট অশ্লীল বাক্য রচনা করা যায়'।
১৯। 'শ্লীলতা-অশ্লীলতার কষ্টি পাথর হচ্ছে কাব্যরসিক সমাজের রুচি'।

Sub Unit-7

শিল্পে অনধিকার
শিল্পের অধিকার
দৃষ্টি ও সৃষ্টি
সৌন্দর্যের সন্ধান
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)

১৮৭১ খ্রী: ৭ই আগস্ট, জন্মাষ্টমীর দিনে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। মুখে মুখে গল্প বলার ক্ষমতা দেখে অভিভূত রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে, গল্প কর তেমনি করেই লেখো'। সেই উৎসাহে লিখলেন 'শকুন্তলা'- যেন কথা দিয়ে ছবি আঁকা গ্রন্থ, এরপর 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', 'বুড়ো আংলা' আরও বহু রচনা। তাঁর রচিত আরও গ্রন্থগুলি হল 'ভারতশিল্প' (১৯০৯), 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯), 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' (১৯৪৭) এই মহান শিল্পী ১৯৫১ খ্রী: ৫ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন।

শিল্পে অনধিকার

আলোচ্য প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন শিল্পচর্চার গোঁড়ার পাঠই হচ্ছে শিল্পবোধ, শিল্পবোধ না থাকলে কারোরই শিল্পচর্চার অধিকার জন্মায় না। পুথির জ্ঞান নিয়ে কারিগর হওয়া যায়, কিন্তু শিল্পী হওয়া যায় না। যতদিন মানুষ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার শক্তিকে উপলব্ধি করেনি ততদিন সে থেমেছিল। যেদিন শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা পেল সেদিন থেকে সৃষ্টি হতে থাকল শিল্প। যেদিন শিল্পকে আমরা নিজের বলার অধিকার অর্জন করন সেদিন শিল্পে শিল্পে আর অনধিকার থাকবে না। দেশ-কাল ভেদে শিল্পীর সকল শিল্প কর্মই শিল্প পিপাসু মানুষের রস তৃষ্ণার নিবারন ঘটাবে। শিল্প নিজের নিয়মে চলে। তাই শিল্পের অধিকার নিজেকেই অর্জন করে নিতে হয়।

তথ্য

১। 'শিল্পে অনধিকার' প্রবন্ধটি 'প্রবর্তক' পত্রিকার ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
২। পরে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' (১৯৪৭) গ্রন্থে গৃহীত হয়।
৩। 'শিল্পে অনধিকার' প্রবন্ধের শুরুতে প্রাবন্ধিক ১৫ বৎসর পূর্বের স্মৃতিচারন করেছেন।
৪। 'Art is not a pleasure trip, it is a battle, a mill that grinder"-Milletz
৫। শিল্পের একটা মূলমন্ত্র হচ্ছে 'নালমতিবিস্তরেন'। শিল্পচর্চার গোরার পাঠ হচ্ছে শিল্পবোধ, যেমন শিশুশিক্ষার গোড়াতে হচ্ছে শিশুবোধ।
৭। 'রমণীর শিরোমনি তাজ, দুনিয়ার মালিক শাহাজাহান তার স্বামী'।
৮। 'শিল্পে অনধিকার' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'রোঁদাকে' বলেছেন- 'ইউরোপের মহাশিল্পী'।
৯। শিল্পের সাধনা মানুষ করেই চলল পৃথিবীতে এসে অবধি।
১০। সূর্যের কণা দিয়ে গড়া কোনার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে গড়া তাজ।
১১। জাপানের শিল্পী শ্রীমৎ ও কাকুরা যখন শেষ বার এদেশে এলেন তখন শঙ্কট রোগে শরীর ভগ্ন কিন্তু শিল্পচর্চা, রসালাপের তাঁর বিরাম নেই।
১২। প্রাবন্ধিকের মতে, ইউরোপের মহাশিল্পী হলেন রোদাঁ।
১৩। ফিডিয়াম, মাইলোস, রোদাঁ, মেন্ট্রোডিফ ব্রেজেস্কা- এই সকল শিল্পীদের উল্লেক রয়েছে প্রবন্ধে।
১৪। আরব্য উপন্যাস, নায়াগ্রা নির্ঝরের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে প্রবন্ধে।

উদ্ধৃতি

১। 'শিল্পীর যর্থাথ আনন্দ হচ্ছে ফোটার গৌরব'।
২। 'রসবোধই নেই রসশাস্ত্র পড়তে বলায় যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্পচর্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়'।
৩। 'শিল্পই তো তার অভেদ ধর্ম, এই তো তার সমস্ত নগ্নতার উপর অপূর্ব রাজবেশ'।
৪। Inspiration অমন হঠাৎ আসে না।

৫। কিন্তু অর্জন নেই, Inspiration এল - গড়তে গেলেম তাজ, হয়ে উঠল গম্বুজ, গড়তে গেলেম মন্দির, হয়ে উঠল ইস্টিশান বা সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া বেখাপ্পা কিছু।

শিল্পে অধিকার
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্প সৃষ্টির জন্য কোন আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হলে শিল্পসৃষ্টির উপযোগী কোন না কোন আয়োজন ঠিক হয়ে যায়। যার মধ্যে রসের তৃষ্ণা বা শিল্পের ইচ্ছা জাগবে সে যেমন করে হোক একটা উপায়ে করে নেবে তার প্রকাশের জন্য, শিল্পের বাসনা জাগলে শিল্পী হাতের কাছে যা পায় তা দিয়ে তার সৃষ্টিকর্মকে গড়ে তোলে। শিল্পীকে শিল্পের ইচ্ছা বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কালিদাস সভাকবি হয়ে কেবল ফরমায়েশি কাব্য রচনা করেননি, অন্তরের সৃজন-শীলতার তাগিদ থেকেই তিনি অমর সৃষ্টি করে গেছেন। সুতরাং শিল্পে অধিকার পাওয়ার জন্য কোনো আয়োজন, কোনো শাস্ত্রচর্চাই দরকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে যার মধ্যে ইচ্ছা জাগে তারই থাকে শিল্পের অধিকার।

তথ্য

১। 'শিল্পে অধিকার' প্রবন্ধটি 'বাগেশ্বরী' শিল্পে প্রবন্ধাবলী। গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত।
২। Artis এর অর্ন্তনিহিত অপরিমিত (বা infinit) artist এর স্বতন্ত্রতা (individualit) - এই সমস্তর নির্মিত নিয়ে যেটি এল সেইটেই art।
৩। Art এর লক্ষণ হল আড়ম্বর শূন্যতা-smiplicity।
৪। 'শিল্পে অধিকার' প্রবন্ধে ব্যবহৃত কিছু পঙক্তি-
ক) 'বাগো না জায়ে নাজা,
তেরে কায়া যে গুলজার'।
খ) 'মৃগা পাসা কস্তুরী বাম
আপন খোঁজে খোঁজে ঘাস'।
গ) 'পানী বিচ মীন পিয়াসী
মোহি সুনসুন আওত হাঁসি'।
৫। 'চেরি ফুল যখন ফুটে তখন সারা জাপানের লোকের মন - সে ফুটে উঠে, ছুটি নিয়ে ছুট দেয় সেদিকে সব কাজ ফেলে'।
৬। জীবন রক্ষা করতে যেটা দরকার, জীবন সেটা ঘাড় ধরে আমাদের করিয়ে নেবেই, ছাড়বে না- নিদারুন তার পেষন-পীড়ন।

উদ্ধৃতি

১। 'খেলতে খেলতে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে সঙ্গে পরিনয় - এই তো ঠিক।
২। 'কাজের জটিলতার শ্রম, শ্রান্তি সমস্তই মেনে নিলে তবে তো সে শিল্পী'।
৩। 'কাজের মধ্যে যদি ধরা না দিই তো সংসার চলে না, আবার কাজেই গা চেনে দিতো রস পাওয়া থাকে দূরে'।
৪। 'শিল্পী দিলেন সৃষ্টিকে রূপ, সৃষ্টি দিয়ে চলল, এদিকের সুর ওদিকে, অপূর্ব এক ছন্দ উঠল জগৎ জুড়ে'।
৫। 'রসের তৃষ্ণা শিল্পের ইচ্ছা যার জাগবে, সে তো কোনো আয়োজনের অপেক্ষা করবে না, - যেমন করে হোক বা নিজের উপায় নিজে করে নেবে'।
৬। 'অর্জন নেই- ইনসপিরেশন এল, গড়তে গেলাম তাজ, হয়ে উঠল গম্বুজ, গড়তে গেলেম মন্দির, হয়ে উঠল গম্বুজ, গড়তে গেলেম মন্দির-হয়ে পড়ল ইস্টিশান বা সৃষ্টি ছাড়া বেয়াড়া বেখাপ্পা কিছু'।

দৃষ্টি ও সৃষ্টি
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা ব্যাক্তিত্ব। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানবজাত যে সহজাত দৃষ্টি নিয়ে জন্মেছে তাই দিয়ে জগৎ ও জীবনকে চেনে। শিল্পী তার দৃষ্টি অনুযায়ী শিল্পের সৃষ্টি করে। প্রতিটি ব্যাক্তির দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথের মতে দৃষ্টি তিন রকমের - তীক্ষ্মদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি। ব্যাক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় প্রতিফলিত হয় তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। যে কেবল অক্ষর পরিচয় করেছে, আর যে অক্ষর গুলোর অর্থ বোঝে। এ দুজনের দেখা নিশ্চয় এক হতে পারে না। আবার যে লেখার মধ্যে সৃষ্টির রহস্য ও রস ধরতে পারল, তার দৃষ্টিও এদের থেকে

আলাদা। এটা সম্ভব হয় সহজাত শক্তিকে অনুশীলন ও সাধনার মধ্য দিয়ে সুশিক্ষিত করার ফলে। ভাবুকের দৃষ্টি, কাজের দৃষ্টি- একইরকম নয়। স্রষ্টার দৃষ্টি হল ভাবুকের কাজ-ভোলা দৃষ্টি। অপরদিকে কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। কৃষক তার স্বার্থ দৃষ্টিতে মাঠভরা ধানক্ষেত্র দেখে লাভ-লোকসানের হিসেব করে। কিন্তু ভাবুকের চোখে ধরা পড়ে ধানক্ষেত্রের সবুজ সৌন্দর্য। সৃষ্টির বাইরে যা, তাকে উন্মোচিত করার জন্য প্রয়োজন মানস দৃষ্টি। এই দৃষ্টি বলে মানুষ আপনার কল্পনা লোকের গোপনতা থেকে থেকে নতুন নতুন সৃষ্টির সাধনা করতে লাগল-অপরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে উপস্থাপিত করতে লাগল।

তথ্য

১। 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' প্রবন্ধের শুরুতে Goethe এর উক্তি 'Those organs which guide an animal are under man's guidance and control'।

২। 'We have seen mere happenings, but not the deepr truth which is meansureless joy'- এই উদ্ধৃতিটির বক্তা রবীন্দ্রনাথ।

৩। 'রাতি পোহাইল, উট প্রিয় ধন, কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ'- এই উদ্ধৃতি 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। প্রাবন্ধিকের মতে, মানুষের জীবনে দেখা তিনরকম। যথা - শুনে দেখা, চেয়ে দেখা, পরশ করে দেখা।

৫। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগের উল্লেখ আছে।

৬। অবনীন্দ্রনাথের মতে চোখের পড়া হল - বড় গাছ, লাল ফুল, ছোট পাতা, কিংবা জল পড়ে, হাত নড়ে, অথবা নূতন ঘটি, কালো পাথর, সাদা কাপড়।

৭। শোনার পড়া হল - কাক ডাকিতেছে, বাঁশি বাজিতেছে ইত্যাদি।

৮। পরশ করার পাঠ হল - শীতল জল, তপ্ত দুধ, নরম গদি ইত্যাদি।

৯। প্রাবন্ধিকের মতে, ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে সবাই পড়ে চলে শিশু শিক্ষা থেকে বোধোদয় পর্যন্ত।

১০। শয়নবিলাসী ও ভোজনবিলাসী দুটোতে মিলে কবিতা লেখার চেষ্টা করলে যা হতো -
'সুন্দরি সহচরী ভালো জানে চর্যা।
রতনমন্দিরে করে মনিহর শয্যা,
দুই দুই তাকিয়া ঘাটের দুই ধারি,
জেল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি'।

১১। ভাবুক বাসকসজ্জা কবিতা লিখলে যা হত -
'অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে
পুন: পুন: উটয়ে চকিত'।

১২। 'ভাবুলের কাজ-ভোলা দৃষ্টি অত্যন্ত কাজের সামগ্রী'।

১৩। বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যর্থাথ শোভা সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি।

১৪। 'ভোলা', 'বাঁকা', হিন্দুস্থানীতে এ দুটোর অর্থ সুশ্রী।

১৫। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক দ্রষ্টা হয়ে বসল দ্বিতীয় স্রষ্টা।
অপরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অবোলকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ রংহীনকে রং দিয়ে চলল মানুষ।

উদ্ধৃতি

১। 'করু পান্ডব মিলে একশো পাঁচ ভহি, দ্রোনাচার্য যখন আন্দাজের পরীক্ষা নিলেন তখন দেখা গেল একশ চার ভাইয়ের শুধু চোখ আছে-দৃষ্টি আছে কেবল একমাত্র অর্জুনের'।

২। 'মানুষের এই বস্তুগত দৃষ্টি চিরদিন তার স্বার্থ বুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো থাকে'।

৩। 'নিছক কাজের দৃষ্টি দিয়ে কাজের মানুষের কাছে, মাঠখানা কৃষিতত্ত্বের ও নীতিশাস্ত্রের বইয়ের পাতার মতোই দেখাল'।

৪। 'বিশ্বজগৎ একটা নিত্য উৎসবের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয়'।

৫। 'তুমি দর্শনীয় বস্তুর যেটি দেখবার যোগ্য সেইটি যখন দেখতে পেলে না তখন তুমি বিফলই চক্ষু পেয়েছ'।

teachinns Text with Technology

সৌন্দর্যের সন্ধান
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ সহজ কথায় সুন্দর ও অসুন্দর সবই আপেক্ষিক এই ভাবনাটাই পোষন করেছেন। সৌন্দর্যের সন্ধান সহজাত। আমাদের যা মনে ধরে না, আমরা তা এড়িয়ে যাই। সৌন্দর্যের আকঙ্ক্ষা মানুষের পূর্ন হয় না। কারন মানুষ নিজেই অপূর্ন। তাই পূর্নতার দিকে তার মানসযাত্রা, তাত্ত্বিক পন্ডিতেরা সৌন্দর্যতত্ত্ব বিশ্লেষন করে সৌন্দর্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা শিল্পে যদি সুখদ, কেজো, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সংগতি, অপরিমিত, সুশৃঙ্খল, সুসংহত- বিচিত্র-অবিচিত্র, সম-বিষম দুই বিপরীতের সমন্বয়-সাধিত হয় তবে তা সুন্দর। এই সমস্ত পন্ডিতি ব্যাখ্যার মধ্যে সৌন্দর্যের যার নিহিত আছে বলে, প্রাবন্ধিক মনে করেন না, মানুষের আদর্শ রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর-অসুন্দরের বিচারের মানদন্ড পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সুন্দর-অসুন্দরের এই দ্বন্দ কোনোদিনই মিটবার নয়। তাই সুন্দর-অসুন্দরকে বোঝার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে খুঁজে নিতে হয়।

তথ্য

১। সৌন্দর্যের সন্ধান' প্রবন্ধটি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের অর্ন্তগত।
২। সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরকে সঙ্গে হল মনে না ধরার ঝগড়া।
৩। আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পনেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দর দেখি।
৪। নিগ্রোদের আর্ট, যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিস্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য রং রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেপে বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।
৫। ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মানি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ী'।
এই শ্লোকটির বক্তা শ্রীচৈতন্য।
৬। আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিষ্ট কিংবা সাধারন মানুষের মন বিচার করতে বসে না।
৭। 'আপরুচি খানা-পররুচি পহেরনা'- এই হিন্দী প্রবাদটি প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে।
৮। 'সবহি মূরত বীচ অমূরত, মূরতকী বলিহারী'। এটি কবীরের উক্তি।
৯। কালিদাসের আমলে সুন্দরীকে আদর্শ - 'তেন্বী শ্যামা শিখরিদশনা'।
১০। 'যত্ন লগ্নং হি মস্য হৃৎ'- এটি সৌন্দর্যের সন্ধান', প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।
১১। আর্টের স্রোত চিরকাল চিরসুন্দরের দিকে'।

উদ্ধৃতি

১। 'সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না'।
২। 'জীবের মনস্তত্ত্ব যেমন জটিল তেমন অপরা, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র অপরিমেয়'।
৩। 'বিশেষ বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পন্ডিতেরা ছাড়া কোনো আর্ট্রিস্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই, এতেই সুন্দর'।
৪। 'ভক্ত বলেন ভক্তিরসই সুন্দর আর সব অসুন্দর'।
৫। 'যার মন যেটাতে টানল তার কাছে সেইটেই হল সুন্দর অন্য সবার চেয়ে'।
৬। 'আর্টিস্টের কাছে রসের ভেদ আছে'।
৭। 'সুন্দর-অসুন্দরের বোঝা-পড়া আমাদের ব্যাক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে'।
৮। 'আদর্শটা এমনই অস্থায়ী করা মুশকিল'।
৯। 'আর্টিস্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিসটাই অসুন্দর'।
১০। 'আর্টিস্ট কিংবা সাধারন মানুষের মন সুন্দরকে নিয়ে বিচার করতে বসে না'।
১১। 'সুন্দরও সবসময়ে মুখও দেয় না কাজও দেয় না'।
১২। সুন্দরকে-অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়'।
১৩। 'সুন্দর জিনিসের বাইরের উপকরন আর ভেতরের পদার্থে হরিহর আত্মা। বহিরঙ্গ যা, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ যুক্ত হয়ে সুন্দর বর্তমান হল'।

teachinns Learning Next with Technology

Sub Unit-8

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, পারিবারিক নারীসমস্যা, ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২)

অন্নদাশংকর রায় প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে অনুসরণ করেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধগুলিকে বলেছেন - 'বাংলা সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ'। অন্নদাশংকরের প্রবন্ধে রয়েছে একদিকে আছে প্রাচীন ইতিহাসবোধ অন্যদিকে রয়েছে পাশ্চাত্য জীবনবোধ। প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ হল 'তারুণ্য'। অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলি হল 'পথে প্রবাসে', 'আমরা', 'দেশ-কাল-পাত্র', 'আধুনিকতা' প্রভৃতি।

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশংকর রায় জীবনকাহিনী মূলক যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লেখা এই প্রবন্ধটি। উপরিউক্ত প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রামমোহন, প্রবর্তিত ঐতিহ্য এবং দেবেন্দ্রনাথের ঋষি দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতিনিয়ত আকাঙ্খা - রবীন্দ্রনাথকে চলার পথের পাথেয় যুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের দিনগুলির সত্যত্য, সম্পূর্নতাম শিক্ষার আধুনিকীকরনের জন্য শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যা শ্রম প্রতিষ্ঠা, প্রিয় বিচ্ছেদের বেদনা, পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত হওয়া, দেশপ্রেমিক রূপে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার প্রতিবাদ সর্বোপরি মুক্তপুরুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা - এ সবই অন্নদাশংকর রায় তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এমন একটি পূর্নতীর্থের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের উত্তর পুরুষেরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন এই বলে 'কীভাবে বাঁচব' এই জিজ্ঞাসার নি:শব্দ উত্তর তিনি দিয়ে গেছেন।

তথ্য

১। ১৯৩১ সালে 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত।
২। প্রবন্ধের শুরুতে রামায়নের অহল্যা চরিত্রের প্রসঙ্গ আছে।
৩। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িক করে কাব্যে, নাটক, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থিসিস লেখেননি।
৪। রামমোহন রায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত।
৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঋষি-দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতিনিয়ত আকাঙ্খা।
৬। 'ছিন্নপত্র', 'ঘরে-বাইরে' নামক রবীন্দ্র রচনার উল্লেখ আছে প্রবন্ধে।
৭। রবীন্দ্রনাথের ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেয়েছেন তাই ভগবান হয়েছে তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হয়েছেন সখা ও প্রেমিক।
৮। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশকে ও নিকটের সঙ্গে দূরকে মিলিয়ে দেখা, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় মহাদেশের বহুকালীন আদর্শ।
৯। রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে বিচক্ষণ ছিলেন।
১০। রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থাশ্রমের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে।
১১। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন মিলে স্বদেশী বস্ত্রের দোকান খুলেছিলেন।
১২। দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত করে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার, ব্রত নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর সেই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মাচর্যাশ্রম।
১৩। অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়। তাঁর 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলী', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' এই বেদনারই রূপান্তর।
১৪। রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি বাংলা রচনার ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন, সেগুলি আইরিশ কবি ইয়েটসকে পড়তে দেন।
১৫। বাংলা দেশের পদ্মা নদীতে নৌকাবাস করবার সময় তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বাস করেছেন।
১৬। রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বে-সরকারি লিগ স্থাপন করেন - অব নেশন্‌স্ নয়-অব কালচ্‌রস।
১৭। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'- এটি 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।
১৮। রবীন্দ্রনাথের উত্তম পুরুষেরা এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন যে 'কী ভাবে বাঁচব' এই জিজ্ঞাসার নি:শব্দ উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

উদ্ধৃতি

১। ‘পরোপকার করতে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার ফলে পরে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত‘।
২। ‘অধীত বিদ্যা প্রচার, করার চেয়ে বিদ্যার সৌরভ বিকিরণ করাই যথার্থ পান্ডিত্য‘।
৩। ‘আজ যারা পরিপূর্ন রূপে ফুল হতে পেরেছে তারাই কাল পরিপূর্ণ রূপে ফল হতে পারে, অপরে নয়‘।
৪। ‘রবীন্দ্রনাথ চিরদিন up to date!!
৫। ‘স্বার্থের উর্ধ্বে না উঠতে পারলে মিলন সত্যকার হতে পারে না‘।
৬। ‘মানুষ যেখানে জ্ঞান বিনিময়, প্রীতিবিনিময় করে, সেইখানে তার মিলনতীর্থ‘।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ
অন্নদাশংকর রায়

প্রাবন্ধিক ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ এই প্রবন্ধে বিশ্লেষন করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি হল গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মতো তিনটি স্রোতের ত্রিবেণী সংগম। প্রাচীন আর্য বা হিন্দু হল গঙ্গা। মধ্যযুগীয় মুসলিম বা সারাসেন হল যমুনা এবং আধুনিক ব্রিটিশ বা ইউরোপীয়রা হল সরস্বতী।

প্রথমে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরস্বতী নামক বেণীটি ছাঁটা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটিকে সমর্থন করেননি। এরপর বাঁধে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা, ক্রমে সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মুসলিমবর্জিত। ভারতীয় সংস্কৃতির আদি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এখানে কেবল একটি সংস্কৃতি নয়, একাধিক ধারায় সমন্বয় ঘটেছে। ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বেশভূষা, রন্ধনকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব যেদিক থেকে বিচার করা হোক না কেন ভারতীয় সংস্কৃতি ত্রিবেনীর জল। প্রাবন্ধিক এর সঙ্গে আর একটি বেনী যোগ করেছেন তা হল চির উপেক্ষিত লোকসংস্কৃতি। এটি চতুর্থ একটি ধারা। অথর্ব বেদের মতো সবচেয়ে পুরাতন অথচ সবচেয়ে নতুন।

তথ্য

১। ‘ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ‘ প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৯৫৫ খ্রী:।
২। অন্নদাশংকর রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা হল - ভারতের সংস্কৃতি হচ্ছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মতো তিনটি স্রোতের ত্রিবেনী সংগম।
৩। সরস্বতীকে বাদ দিলে গঙ্গা-যমুনার যুক্ত বেণী যা হিন্দু মুসলমানের যৌথ সম্পদ।
৪। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও খ্রিস্টীয় ও মুসলমান মতের সাধনা করতেন।
৫। তিনটি বেনীর মধ্যে গঙ্গা চিরদিনই বড়ো ছিল, চিরদিনই বড় থাকবে।
৬। ইসলাম প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতের মাটিতে রয়েছে।
৭। অন্নদাশংকর রায়ের মতে ইংরেজ আমলের লাভ, ‘শশধর, হাকসলী ও গুজ‘।
৮। প্রাবন্ধিক লোক সংস্কৃতির দুটি ধারার কথা বলেছেন -
ক) রূপকথা - ‘রূপকথা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক‘।
খ) ছড়া - ‘এক একটি ছড়ার বয়সের গাছ পাথর নেই‘।
৯। ভবিষ্যতের সংস্কৃতির গর্বকারীদের চারটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা বলা হয়েছে -
ক) বৈদিক বৌদ্ধ সংস্কৃতির ম্যাট্রিকুলেশন
খ) মুসলিম সংস্কৃতির ইন্টার-মিডিয়েট
গ) পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বি-এ
ঘ) লোকসংস্কৃতির এম-এ
- এই চারটি সংস্কৃতির সমন্বয়কে ‘আমাদের সংস্কৃতির চতুরঙ্গ‘ বলেছেন প্রাবন্ধিক।

উদ্ধৃতি

১। ‘রূপকথা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক‘।
২। ‘এক একটি ছড়ার বয়সের গাছপাথর নেই‘।
৩। ‘সংস্কৃতির স্বভাবই এই যে, তার মধ্যে বহু স্বতোবিরোধ, স্ববিরোধ থাকে‘।
৪। ‘যে সংস্কৃতি নানা বিবাদী সুরকে সংগতি দিতে জানে না, সে তার শুদ্ধতা নিয়ে কালগর্ভে বিলীন হয়‘।
৫। ‘চারটি অঙ্গ মিলেই আমাদের সংস্কৃতির চতুরঙ্গ‘।

৬। ‘ভাঙন অপ্রীতিকর, পলিমাটি প্রীতিকর। ভাঙনের কথা মনে পুষে রাখব না, পলিমাটির উপর নতুন ফসল ফলাব‘।
৭। ‘এর ইতিহাস কেউ জানে না, অথচ সকলের ইতিহাস এর মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে‘- লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে।

পারিবারিক নারী সমস্যা
অন্নদাশংকর রায়

প্রবন্ধটি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অন্নদাশংকর রায়ের তরুন বয়সে লেখা একটি বিখ্যাত এবং বিতর্কমূলক প্রবন্ধ। ‘পারিবারিক নারী সমস্যা‘ প্রবন্ধে সমাজ ও পরিবারে নারীর অবস্থান সম্পর্কে প্রাবন্ধিক একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন। নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা তার স্বাতন্ত্র্যে, আর এই স্বাতন্ত্রের জন্য দরকার আর্থিক স্বাবলম্বন। আর্থিক স্বাবলম্বন ছাড়াও যেদিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, আর প্রতিষ্ঠ নারীর সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষের স্বেচ্ছামিলন হবে সেখানে স্থূল স্বার্থের পরিবর্তে সূক্ষ্ম স্বার্থই প্রবল হবে। সেদিন হয়তো বিবাহের প্রয়োজন নেই। সেদিন নারী মুক্ত আকাশের বিহঙ্গের মত অবাধে বিচরন করতে পারবে।

তথ্য

১। ‘পারিবারিক নারীসমস্যা‘ প্রবন্ধটি ১৯২৩ সালে ‘ভারতী‘ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।
২। প্রবন্ধের শুরুতে ইবসেনের "Doll's House" নাটকের উল্লেখ করা হয়েছে।
৩। "Doll's House" নাটকটির নায়িকা হল নোরা।
৪। ‘সর্বপ্রথমে আমি মানুষ, তারপরে পত্নী ও জননী‘- এই উক্তিটির বক্তা নোরা।
৫। বিদ্রোহিনী নোরা স্বামীকে সত্যি কথা ব্যক্ত করেছেন - "I live by performing tricks for you"।
৬। বাংলার ‘শুভা‘ বলেছে ‘কেন পুরুষের আশ্রয় ছাড়া কি স্ত্রীলোকের চলে না‘।
৭। নারী চায় পুরুষের আশ্রয়, তাই তাকে দাম দিতে হয় আত্মমর্যাদা।
৮। প্রেম ভঙ্গ হলেই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে, আর সেজন্য প্রস্তুত থাকা চাই।
৯। নারীকে কেবল যে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে তাই নয়, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে - তবেই পরিবারে নারীর সম্পূর্ন স্বাধীনতা থাকবে।
১০। নারীর অক্ষমতার উপর নির্ভর করে সৃষ্টি হয়েছে-বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহে বাধা, বরপন, কন্যা বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয়, স্ত্রী বিনিময়, সহমরণ, অবরোধ, স্বামী সৌভাগ্যের চিহ্ন ধারন, কন্যাদান, স্বামীসেবা, বিবাহ প্রভৃতি অপমান কর শব্দ।
১১। বর্মায় কয়েকদিন একত্র থাকলেই পতিপত্নী হতে পারা যায়, নারী যে দেশে নিজেকে ও নিজের সন্তানকে অনেক স্থানে স্বামীকেও প্রতিপালন করেন।
১২। নারীর অধীনতা, দাসীত্ব ও হীনতা সেইখানেই বেশি যেখানে সে আর্থিক স্বাধীনতা না পেয়ে পুরুষের গলগ্রহ হয়েছে।
১৩। দুজন স্বাধীন যুবক-যুবতী যাদের মধ্যে একমাত্র প্রেমের বাঁধন একনিষ্ঠ তারাই পরিবার সৃষ্টি করে।
১৪। অধিকারবোধ জন্মালে প্রণয়ের জোর কমে যায়।

Sub Unit-9
রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, রামায়ন, উত্তর তিরিশ, জীবনানন্দ দাশ এর স্মরনে পুরানা পল্টন। বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮ খ্রী: ৩০ শে নভেম্বর। মৃত্যু ১৯৭৪ খ্রী: ১৮ ই মার্চ। পিতা- ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা- বিনয় কুমারী। পিতা-মাতা উভয় কুলের আদি নিবাসি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অর্ন্তগত মাখাখানগর গ্রামে রবীন্দ্রত্তোর যুগের একজন উল্লেখযোগ্য কবি, কথা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার এবং সমালোচক। প্রবন্ধশিল্পী হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর তার মৌলিকতার কারন হল সাহিত্যিক বিষয়, বিশিষ্ট গদ্য রচনা, রীতি, স্বতন্ত্র বাগভঙ্গি এবং সুললিত ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক
বুদ্ধদেব বসু

প্রবন্ধটি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসুরি কবিদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্লেষনধর্মী আলোচনা করেছেন।
প্রথম পরিচ্ছেদে আছে - বাঙালি কবির পক্ষে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড় সংকের সময়।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে - সত্যেন্দ্রনাথ ও সমকালীন কবিদের মূল্যায়ন।
তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে - কল্লোল গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা ও বাংলা সাহিত্যে মোড় ফেরাবার ঘন্টাধ্বনি।
চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে - দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী কবিদের মূল্যায়ন ও 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার'।
প্রাবন্ধিক যে মতটি এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন বাংলা সাহিত্য যদি রবীন্দ্র ভাবরসে ডুবে থাকে তাহলে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যত অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহন করেই নিজস্বতার পরিচয় তৈরী করে নিতে হবে। এই জন্যই রবীন্দ্রমনন থেকে বের হয়ে বুদ্ধদেব কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের (বা লেখকদের) বরন করে নিয়েছিলেন। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা বেশ কিছুটা রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত, স্বাধীন এবং আধুনিক। সুতরাং প্রাবন্ধিকের মতে -
'রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হয়ে, বিক্রি হয়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে, তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে, আগামী কালের বাঙালি কবিকে, এইখানে বাংলা কবিতার বির্বতনের পরবর্তী ধাপের ইঙ্গিত আছে'।

তথ্য

১। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধটি 'সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধ গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত। প্রবন্ধটি বুদ্ধদেব বসু রচনা করেন ১৯৫২ সালে।
২। বাংলায় স্বভাব কবি কথাটা, প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ্য করে।
৩। গোবিন্দদাসের রচনায় এক অদ্ভুত ঘোষনা পাওয়া যায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হলেও, রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব অনুভব করেননি। এই জন্যই তাঁকে খাঁটি কবি বলা যায়।
৪। সাধারন অর্থে কবি মাত্রই স্বাভাবিক, যেহেতু কোনোরকম শিল্প রচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না।
৫। যিনি একান্তই হৃদয় নির্ভর, প্রেরনায় বিশ্বাসী অর্থাৎ যিনি যখন যেমন, প্রান চায় লিখে যান কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যাঁর মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির সতিন সম্বন্ধ তিনিই হলেন স্বভাব কবি।
৬। রবীন্দ্রনাথ সে ধরনের কবি নন, যাঁকে বেশ আরাম সহকারে উপভোগ করা যায়, তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে-পদে।
৭। রবীন্দ্রনাথের দুই তরলিত, আরামদায়ক সংস্করন-গদ্যে শরৎচন্দ্র, পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৮। রবীন্দ্র সমসাময়িক সাধারন পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন করে চেয়েছিলো তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ।
৯। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক কবি নজরুল ইসলাম।
১০। যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর যে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।
১১। যে কবিদের কৈশোরে যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনারতরী', 'চিত্রা', 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি'- সেই মায়ায় না মজে উপায় ছিল না তাদের।
১২। রবীন্দ্রনাথকে পাবার জন্য যে মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের তা হল তিনি, বাংলা ভাষার কবিতা লেখার কাজটি অনেক কঠিন করে দিয়েছেন।

১৩। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের পরে কবিতা লেখা সহজ হয়ে গেলো, ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা বিচিত্র রকমের স্তবক বিন্যাসের নমুনা সব তৈরি হয়ে গিয়ে। কিন্তু এখানেই তাঁরা উল্টো বুঝেছিলেন।

১৪। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু চোখ ভরে যা দেখেছেন তাই লিখেছেন। আবহমান ইতিহাস লুট করেননি, পারাপার করেননি বৈতরণী অলকানন্দা।

১৫। 'মনে হচ্ছে আমিও এখন লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি'- এই সর্বনাশী ধারণাটিকে প্রশয় দেন রবীন্দ্রনাথের রচনা।

১৬। রচনাবলীর প্রথম খন্ডের ভূমিকায় তাঁর 'মানসী' পূর্ব কবিতাবলীকে লক্ষ্য করে যে কথাটা তিনি বলেছিলেন - 'আমরা যাকে বলি ছেলে মানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে যেটা অতি উত্তম, রচনা রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য'।

১৭। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে 'ছেলেমানুষি' আখ্যা দিয়েছেন।

১৮। 'ছেলেমানুষি', মানে মনের কথাটির অবারিত উচ্চারন।

১৯। রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে আজকের দিনে আর সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়োজন হয় না।

২০। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে সন্দেহ হয় তাঁর অনুভূতিটাই কৃত্রিম।

২১। সাধারন পাঠক (তখনকার) রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন করে চেয়েছিলেন তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ।

২২। প্রাবন্ধিক সত্যেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের তুলনা দিতে গিয়ে যে দুটি কবিতার উল্লেখ করেছেন তা হল-

ক) তুলতুল টুকটুক/টুকটক তুলতুল
কোন ফুল তার তুল/ তার তুল কোন ফুল
টুকটুক রঙ্গন/ কিংশুক ফুল্ল
নয় নয় নিশ্চয়/ নয় তার তুল্য
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'পিরানের গান',

খ) ওগো বধূ সুন্দরী/ তুমি মধুমঞ্জুরী
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন
পর্নের পাত্রে/ ফাল্গুন রাত্রে
মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন
রবীন্দ্রনাথ

এই দুটি কবিতা একই ছন্দে লেখা।

২৩। ভালো কবি না হলে ভালো ছন্দও লেখা যায় ন। যিনি যত বড়ো কবি, কলা কৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর।

২৪। গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনতিপরেই দুজন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখক - প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ।

২৫। প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলেন নজরুলের 'বিদ্রোহ' কবিতায়।

২৬। নজরুল ইসলাম স্বভাব কবি।

২৭। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় মৌলিক কবি নজরুল ইসলাম।

২৮। বুদ্ধদেব বসু নিজেই রবীন্দ্র বিরোধী লেখকদের মধ্যে একজন। তিনি রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতেন আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতেন রবীন্দ্রনাথকে আক্রমন করে।

২৯। 'ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইবো না, আতা ফলের ফরমাশ দেবো' - 'শেষের কবিতা'র এইটাকেই তখনকার পক্ষে সত্য বলে ধরা যায়।

৩০। বিষ্ণু দে বঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য করে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে।

৩১। অমিয় চক্রবর্তী বিস্ময় আনলেন ব্যাকরনে বৈচিত্র্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানারকম গদ্য বিষয়ের আমদানি করলেন।

৩২। 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'
(রবীন্দ্রনাথের 'বধূ')
তাকে 'গোলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো'
(সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'বধূ')
'কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা'
(রবীন্দ্রনাথ 'বধূ')
'কলসী কাঁখে চলছি মৃদু তালে'
(সুভাষ-'বধূ')

- এইরকম আক্ষরিক অনুকরণের মাধ্যমে মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

৩৩। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তিবন্ধন' থেকে পরিত্রানের প্রমান।

উদ্ধৃতি

১। ‘বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্য শক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান‘।
২। ‘প্রতিদিনের সুখ দু:খের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে ওঠা পলাতক এক একটি রঙিন বেদনা-তাই ধরে রেখেছেন তাঁর কবিতায় আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে‘।
৩। ‘যে ফুল ছিল বিশ্বসত্তার প্রতীক, তা হয়ে উঠলো শৌখিন খেলনা‘।

রামায়ণ
বুদ্ধদেব বসু

প্রবন্ধটি ৬ টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু ‘রামায়ণ‘ রচয়িতাদের রচিত গ্রন্থটির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।
প্রথম পর্যায়ে আছে - উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘ছোট্টরামায়ণ‘ গ্রন্থ পাঠে প্রাবন্ধিক পেয়েছেন ছন্দের আনন্দ কবিতার উন্মাদনা। বাল্মীকি আর কৃত্তিবাস রামায়নেরও তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে স্বল্প পরিমানে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে - রাজশেখর বসু কৃত ‘রামায়ন‘ হল বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদের আলোচনা।
তৃতীয় পর্যায়ে আছে - কৃত্তিবাস যথেষ্ট নন, বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের প্রয়োজন। কৃত্তিবাস যে সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যে রামায়ণ রচনা করেছিলেন তার বর্ননা পাওয়া যায় এই পর্যায়ে।
চতুর্থ পর্যায়ে আছে - রামায়ণের সব থেকে বড় সমস্যা রাম চরিত্রের বিশ্লেষনে আদি রামের মহিমা অনেকটা জুলিয়াস সীজারের অনুরূপ।
পঞ্চম পর্যায়ে - রাম চরিত্রের আদর্শ নিয়ে পর্যালোচনা।
ষষ্ঠ পর্যায়ে - রামায়ণের বিভিন্ন ত্রুটির আলোচনা।

তথ্য

১। ‘রামায়ণ‘ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ‘ কবিতা‘ পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে।
২। ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনের প্রথম যে, বইতে বুদ্ধদেব বসু জেনেছিলেন তা হল উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর ‘ছোট্টরামায়ণ‘।
৩। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতেন, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রের ‘শিশু‘ পত্রিকার পাতাবাহারে চোখ জুড়োতেন প্রাবন্ধিক কিন্তু ‘ছোট্টরামায়ণ‘ এর মতো নেশা তার কোন কিছুতেই ছিল না।
৪। উপেন্দ্রকিশোরের মুখবন্ধ হল - “চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায় রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া সে বড়ো সুন্দর কথা, শোনো মন দিয়া”।
৫। কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধদেবের প্রথম পরিচয় ‘ছোট্টরামায়ণ‘ কে কেন্দ্র করে।
৬। কৃত্তিবাসের ‘রামায়ণ‘ পড়ে বুদ্ধদেব কেঁদেছিলেন।
৭। কালীপ্রসন্ন সিংহের কল্যানে মূল মহাভারতের স্বাদে বুদ্ধদেব বসু বঞ্চিত হননি।
৮। বাল্মীকি আর বাঙালির মধ্যে দেবভাষার ব্যবধান উনিশ শতকী উদ্দীপনার দিনেও ঘোচানো সম্ভব হয়নি এর কারণ হয়তো কৃত্তিবাসের অত্যধিক জনপ্রিয়তা।
৯। কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়নের বাংলা রূপকার, তাঁর কাব্যে রাম লক্ষন সীতা দেব দানব রাক্ষসের মধ্যযুগীয় গৃহস্থ বাঙালি চরিত্রে পরিনত হয়েছেন।
১০। রবীন্দ্রনাথের মতে, রামকে ‘অন্য সমালোচনার আদর্শে‘ বিচার করা যাবে না।
১১। ‘রামায়ণ‘ এর উত্তরকান্ড যে কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন, বাল্মীকি প্রতিম নিশ্চয়ই। বস্তুত রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিনত করলেন তিনিই।
১২। আদি মহাকব্যের নাম দিতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু ‘বাস্তবতা‘। সে বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়ালিজম-এর চরম।
১৩। যা সম্পূর্ণ সত্য রূপে প্রতিভাত হয়। মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পন।
১৪। বাল্মীকি ‘রামায়ণ‘-এ একটি জোর দিয়ে বার বার বলা হয়েছে যে রাম অবতার হলেও মানুষ। মনুষ্যের মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ তিনি। বিশেষ কোনো একটি দেশের বা যুগে নয়, সর্বদেশের, সর্বকালের।
১৫। মহাকাব্য পৃথিবীতে সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি। যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্প কর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা হয়নি।
১৬। চিরকালীন বা শাশ্বত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন দেখা যায় মহাভারতে।

১৭। মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ কাব্য হিসেবে এবং কাহিনী হিসেবে তাতে ঐক্য বেশি। আমরা যাকে কৃতিত্ব বলি তাতে 'রামায়ণ' সম্ভবত সমৃদ্ধতর।
১৮। 'জীবনের এমন কোনো দিক নেই, মনের এমন কোনো মহল নেই, দৃষ্টির এমন কোনো ভঙ্গি নেই - যার সঙ্গে মহাভারত আমাদের পরিচয় করিয়ে না দেয়'।
১৯। রাজশেখর বসুর বাল্মীকির রামযুগের সারানুবাদ- এ হাস্যরসিক বিজ্ঞানীর, ভাষা বিজ্ঞানী ও ভাষা শিল্পীর সমন্বয় ঘটেছে।
২০। রাজশেখর বসুর রামায়ণ উপন্যাসের মত পাঠ করা সম্ভব তবে মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি করে বাল্মীকির মূল শ্লোক।
২১। বাল্মীকি 'রামায়ণ' এর কিস্কিন্ধ্যা কান্ডে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর মধু ঝর্ণাটুকু কৃত্তিবাস তাঁর গ্রন্থে বাদ দিয়েছিলেন।
২২। কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্র - তিন দিক থেকেই এই ঋতু বিলাস সুসংগত ও সুন্দর।
২৩। আদি কাব্য সম্পূর্ণ সত্যের নিরঞ্জন প্রশান্তি, উত্তরকাব্যে খন্ডিত সত্যের উজ্জ্বল বর্ণ বিলাস।
২৪। কৃত্তিবাস যে সভ্যতার প্রতিভূ তার অশান-বশন রীতি নীতি সবটাই নীচু স্তরের।
২৫। বাল্মীকির ভোজ্য তালিকা সুষম, সম্পূর্ণ এবং রাজকীয় অপর দিকে মদ্য-মাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশি কিছু জোটাতে পারেননি।
২৬। বাল্মীকি যদিও তপোবনবাসী তবুও তিনি, রাজধানীরই মুখপাত্র, শ্রেষ্ট অর্থে নাগরিক।
২৭। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামকে অন্য সমালোচনার আদর্শে বিচার করাই চলবে না।
২৮। রাজশেখর বসু অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মেনে নিয়ে বলেছেন-
'যে আধুনিক যুগের সংস্কার নিয়ে রামায়ণ বিচার সম্ভব নয়'।
২৯। পান্ডবের যুদ্ধে, রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে-আর তাই তার শেষ ফল চিত্তশুদ্ধি।
৩০। নিদারুন সংকটে চার মাস চুপ করে বসে থাকতে হবে বলে মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হলেন না রামচন্দ্র।
৩১। উপেক্ষিতা উর্মিলাকে বিখ্যাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।
৩২। আদিকবি চরিত্র চিত্রনে নিছক বাস্তব দৃশ্যতার জন্য ব্যস্ত নন, তেমনি ডিকেন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রত্যেকটি পাত্র পাত্রীর শেষ পর্যন্ত কী হলো তা জানবার দায় থেকে মুক্ত তিনি।

উদ্ধৃতি

১। 'আদি কবি উদাসীন, আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী তিনি নন, শিশুর শিল্পহীনতার পরম শিল্পে তিনি অধিকার করেন আমাদের, কতবার দিয়ে যান, কত ভুলে যান, কত এলোমেলো, অতিরঞ্জন, আবস্তরতা, কোনো কৌশল জানেন না তিনি সাজাতে শেখাননি, আমাদের ধরে রাখে, শুধু তার সত্যদৃষ্টি, তাঁর মৌল সহজ সামগ্রিক সত্য দৃষ্টি।
২। 'হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম, হয়তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা, হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিলো, যা ফিরে পেতে হলে মানবজাতিকে আবার নতুন করে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে'।

উত্তর তিরিশ
বুদ্ধদেব বসু

প্রাবন্ধিক 'উত্তর তিরিশ' প্রবন্ধটি যখন রচনা করেন তখন তিনি মধ্য যৌবনে। অর্থাৎ তাঁর বয়স তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি যাকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'প্রৌঢ়ত্বের শৈশব'। যৌবনের সুখ ববাসনার থেকে উত্তর তিরিশে অনেকটা স্বচ্ছন্দ সাবলীল। এখন তিনি স্বাধীন, বড়োদের শাসন জালের নাগাল তাঁকে স্পর্শ করবে না।

তাঁর মতে নবযৌবনের 'সময় কালটাকে' বিশেষ বিশেষ কবিতা লেখা গেলেও অনেক কাজ সম্পূর্ণভাবে করা যায় না। মধ্য বয়সে পৌছে তিনি ক্রোধ সংযত করতে পারছেন, অভিমানকে দমন করে রেখেছেন, ভালোবাসায় প্রতি একটা অপার্থিব অনুরাগ অনুভব করেছেন, তুচ্ছকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করার শক্তি পেয়েছেন। সুতরাং উত্তর তিরিশের বুদ্ধদেব বসু মধ্য বয়সে পৌছে এমন একটা শক্তিকে অনুভব করেছেন যার দ্বারা অনেক বড়ো বড়ো কম সম্পন্ন করা সম্ভব।

তথ্য

১। বুদ্ধদেব বসুর 'উত্তর তিরিশ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে।
২। প্রকাশকাল-১৯৪৫। প্রচ্ছদ সৌরেন সেন। উৎসর্গ-যতীন্দ্র মোহন ও শোভনা মজুমদার।
৩। প্রকাশ স্থান-কবিতা ভবন
৪। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের উদাহরনে উৎসাহিত হয়ে প্রাবন্ধিক মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন তিরিশের শোচনীয় পরিনাম আসন্ন হবার পূর্বেই যেন তার জীবনের অবসান হয়।

৫। ‘জড়িয়ে ধরার মতো ক্ষনিকের প্রণয়ী অতিথিও নয়, এড়িয়ে যাবার মতো ভয়ংকরও নয় যে‘- যৌবন সম্পর্কে এ উপমা ব্যবহার করেছেন প্রাবন্ধিক।

৬। নবযুবকদের দল যদি প্রাবন্ধিকের বিরুদ্ধতা না করতো, সেটা হতো প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। পূর্ববর্তী এই আক্রমণ পরবর্তীদের যৌবনের স্বাক্ষর, আর প্রাবন্ধিকের আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞান।

৭। প্রাবন্ধিকের কলেজ সহপাঠিনী, সংস্কৃতের অধ্যাপক যাকে ভুল করে ডাকতেন ‘বনশ্রী‘ বলে তার মুখে প্রৌঢ়ত্বের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৮। কোনো বিশেষ একটি মেয়ের দেহে যৌবনের আর্বিভাব একটা জীবতত্ত্ব ঘটিত তথ্য মাত্র, তা নিয়ে বিস্মিত বা উল্লসিত বহার কিছু নেই।

৯। প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসে হারানো যৌবনের জন্য বিলাপ করেছেন কবি - "When we were young! Ah woeful when [কোলরিজ]

১০। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের ভাবনা এইরকম -‘ভাবচ তুমি মনে মনে এ লোকটি নয় যাবার দ্বারে কাছে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসবে আবার‘ [ক্ষণিকা; বিদায়রীতি]

১১। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই যৌবনের তথ্যকে বড়ো করে দেখেননি। তার সত্যকেই দেখেছিলেন - যে কথা স্পষ্ট বলা আছে ‘চিত্রাঙ্গদায়‘।

১২। এক হিসেবে ষোলো বছরের ছেলের মতো দু:খী আর নেই, তার নবজাগ্রত, বিনিদ্র আত্মচেতনা থাকে এক মুহূর্তের শান্তি দেয় না, সে আর ছোট নেই, পুরোপুরি বড়োও সে হয়নি এখনো।

১৩। প্রাবন্ধিকের যখন ১৮-এ পড়ার বয়স, তখন তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন- ঈশ্বর, আমাকে খুব শিগগির বুড়ো করে দাও, তাহলে বাঁচি।

১৪। বয়স্কদের শাসনে শিশুর জীবন এমন আষ্টে পৃষ্টে জড়িত যে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে জীবনে দু:খের ভাগই বেশি।

১৫। উত্তর তিরিশে পৌঁছে প্রাবন্ধিক যা কিছু শিখেছেন -

ক) রাগ চাপতে শিখেছেন।

খ) উদ্যম অভিমানকে দাবিয়ে রাখা শিখেছেন।

গ) ফুটো কলসি থেকে জলের মতো ভালবাসা আর যেখানে সেখানে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে না

ঘ) তুচ্ছকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করতে।

১৬। বুদ্ধদেব বসুর বিশ্বাস জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন নয়। জীবনের মাঝামাঝি অবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো। জীবন যখন মধ্যদিনে, তখন ভোরবেলার সোনালি আলোর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাই সাহিত্যের ঐতিহ্যসংগত।

১৭। এমন একটা অবস্থা নিশ্চয়ই আছে যখন উভয় শক্তির মিলন ঘটে, নয়তো পৃথিবীতে এত বড়ো বড়ো কর্ম সম্পন্ন হতে পারতো না। সেটাই মধ্য বয়স। উভয় শক্তির মিলন বলতে - নবযৌবনের শক্তি, পরিণত বয়সের শক্তি।

১৮। উত্তর তিরিশে পৌঁছে প্রাবন্ধিক বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যে সংযোগ সেটা শুধুমাত্র একটা ভাব নয়, সেটা একটা রূপও বটে, তাকে শুধু অনুভবই করেন না চোখেও দেখেন। এই দেখার পটভূমিকায় আছে অতীত জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা।

উদ্ধৃতি

১. “যৌবনের যেটা নিতান্ত দৈহিক দিক, তার পূর্ণ আমরা সকলেই কোনো না কোনো সময়ে খেয়ে থাকি, অতএব তার গুণ গাইবার লোক কোনো কালেই বিরল হয় না।”

২. “এটা ভালোই যে আমরা জীবনে তারুন্যের উন্মাদনা শেষ হচ্ছে বছরগুলোর উপহার স্বরূপ পেলাম কিছুটা স্থৈর্য্য ও ভারসাম্য।”

৩. “স্মৃতির ভেলকিতে মাঝখানকরে অনেকগুলো বছর ঝাপসা হয়ে আসে, জীবনের অতীতাংশ যতই বহরে বেড়ে চলে, ততই যেন কাছে চলে আসে দূরতর অতীত। বার্ধক্যে বাল্য স্মৃতিই হয় প্রিয়তম আলোচ্য।”

৪. “একদিকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, অন্যদিকে চারিদিকের পাথরের দেয়ালে নির্ঝরের কপাল টুকে মরা।”

৫. “যা ছিল হওয়া তা হয়ে ওঠে ছবি। অল্প বয়সের বাষ্পাকুল মন কিছুই দ্যাখে না, শুধু অনুভব করে - তাই তার আনন্দের মধ্যে দুঃখের পরিমাপ এত বৃহৎ।”

জীবনানন্দ দাশ এর স্মরনে
বুদ্ধদেব বসু

'কল্লোল' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের স্বাক্ষর করা 'নীলিমা' কবিতা প্রকাশিত হয় যার এমন একটি সুর ছিল যার কারনে বুদ্ধদেব বসু লেখকের নাম ভুলতে পারেননি। প্রবন্ধটির সাতটি পর্যায় যার মধ্যে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছেন জীবনানন্দের কাব্যরীতি অর্থাৎ বলা ভালো কাব্যবৈশিষ্ট্য এবং সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরেছেন।

প্রথম পর্যায়ে - 'প্রগতি' পত্রিকায় জীবনানন্দকে আমন্ত্রন জানানো। 'প্রগতি' ও 'ধূসর পান্ডুলিপি'র বেশ কিছু কবিতা প্রকাশ। এছাড়া কবি জীবনানন্দের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রতি উত্তর দেওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ে - 'প্রগতি'তে জীবনানন্দের যে সমস্ত কবিতা বিষয়ে আলোচনা বেরিয়েছিল তার আলোচনা।

তৃতীয় পর্যায়ে - ঢাকায় জীবনানন্দের বিবাহে বুদ্ধদেব বসুর উপস্থিতি ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্যায়ে - জীবনানন্দের কবিতার দুটি ধারা দেখা যায় এবং কোন পর্যায়ে কোন কোন কবিতাকে ফেলা যায় তার বর্ণনা।

পঞ্চম পর্যায় - জীবনানন্দের কবিতার উপর কোন কবিতার প্রভাব পড়েছিল এবং তা নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য প্রভাব তাইই বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পর্যায়ে - উপমা ব্যবহারে তিনি সত্যিই অদ্বিতীয় ছিলেন।

সপ্তম পর্যায়ে - জীবনানন্দ স্বতন্ত্র মনোভাবাপন্ন এক কবি। যার কবিতা আমাদের বোধ এবং মননে নাড়া দেয়। তার কাব্য রীতি 'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো - একেবারে নিজস্ব ও ব্যক্তিগত।

তথ্য

১. 'জীবনানন্দ দাশ' এর স্মরণে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে।
২. প্রবন্ধটি 'কালের পুতুল' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে গৃহীত।
৩. 'কালের পুতুল' প্রবন্ধ গ্রন্থের রচনা কাল ২রা অক্টোবর ১৯৪৬।
৪. 'কালের পুতুল' এর বেশির ভাগ প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায়।
৫. 'কালের পুতুল' প্রবন্ধ গ্রন্থটি 'কবিতা ভবন' থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন যামিনী রায়।
৬. 'ধূসর' পান্ডুলিপি'র ১৭টি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা' - কল্লোল -এ, 'ক্যাম্পে' - পরিচয় -এ 'মৃত্যুর আগে' - কবিতা'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রগতি' প্রত্রিকায়।
৭. 'কবিতা' একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ২ অক্টোবর ১৯৩৫।
৮. 'ধূসর পান্ডুলিপি' যখন গ্রন্থাগারে ছাপা হয় তখন ধাত্রীর কাজ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাই এই গ্রন্থটিকে তিনি নিজের জীবনের অংশ মনে করেছেন।
৯. জীবনানন্দের 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি, 'ধূসর পান্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে নেই এবং পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয়নি।
১০. জীবনানন্দ এমন সব শব্দ কবিতায় বসিয়েছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখবে আশা করেনি যেমন - 'কেঁড়ে', 'নটকান', 'থুতনি' ইত্যাদি।
১১. জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যের মধ্যে 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা দুটি সবচেয়ে প্রানতপ্ত।
১২. জীবনানন্দ দাশের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত রোমান্টিক হয়েও ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো।
১৩. হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে ঢাকা থেকে।
১৪. প্রগতির নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম আর অচিন্ত্যকুমার।
১৫. 'প্রগতি'তে জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দের রচনা প্রচুর পরিমাণে ছাপানো হত।
১৬. 'Remember to Remember' - মার্কিন লেখক হেনরি মিলার এর বই।
১৭. বিষ্ণু দে 'প্রগতি' তে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামন মিত্র' ছদ্মনামে।
১৮. জীবনানন্দের প্রধান বিশেষত্ব যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করেই তিনি কবিতা রচনা করেন।
১৯. প্রেমেন্দ্র মিত্র বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ন সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাকে নিরন্তর পীড়া দিয়েছে। আর জীবনানন্দ এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান।
২০. জীবনানন্দকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে।

২১. অনিল ও সুরেশ এর কথোপকথনের যে স্বরূপ প্রাবন্ধিক তুলে ধরেছেন তা 'প্রগতি' ভাদ্র ১৩৩৬, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ' - এ আলোচিত হয়েছিল।

২২. অনিল ও সুরেশকে বলেছে জীবনানন্দ একজন খাঁটি কবি, তাঁর প্রমান স্বরূপ জীবনানন্দের একটি লাইন উদ্ধৃত - 'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে' - নির্জন স্বাক্ষর

২৩. 'সেই জল মেয়েদের স্তন
ঠান্ডা - সাদা বরফের কুচির মতন'।
- জীবনানন্দের পরস্পর কবিতার লাইন।

২৪. জীবনানন্দের 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাটেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিল। 'স্বর্ণলাইটের জন্য', 'প্রথম ডিমের জন্য', 'রবারের বলের মতন' আর সেখানে লক্ষ লক্ষ মাইল ধরে সমুদ্রের মুখে মৃত্যু ছিল বলে।

২৫. বুদ্ধদেব বসু ঢাকায় জীবনানন্দের সঙ্গে মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরিয়েছিলেন, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বুদ্ধদেব ছাড়া অন্যান্য বন্ধুরাও।

২৬. 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশের সম্মতি পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

২৭. জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। - একদিকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা বর্ণনাধর্মী যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চেয়েছেন।
আর দ্বিতীয় পর্যায়ে কবিতা 'বোধ', 'ক্যাম্পে', 'আট বছর আগের একদিন'।

২৮. জীবনানন্দের আরো যে সমস্ত কবিতার নাম পাওয়া যায় 'জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে' প্রবন্ধে - 'মোটের গল্প', 'হায় চিল', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা', 'অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু সারস'।

২৯. জীবনানন্দ 'ধূসর পান্ডুলিপি'র সময়ই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছেন।

৩০. জীবনানন্দ একটি উপমা প্রয়োগ না করে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিত'র) মতো কবিতা লিখেছেন।

৩১. উপমার উদাহরন দিতে যে লাইনগুলি উল্লেখ করেছেন -
ক) 'আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন'।
খ) রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
গ) জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর।
ঘ) শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা।
ঙ) চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস।
চ) পাখির নীড়ের মতো বনলতার চোখ।

৩২. "আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই - নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই - রূপ ঝরে পড়ে তার - শীত এসে কষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে"।
- জীবনানন্দের 'অবসরের গান' 'ধূসর পান্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থ।

উদ্ধৃতি

১. "শুয়ো পোকার খোলস ঝরে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষনিক বলেই কোনো কিছু উপেক্ষনীয় নয়, কারো হয়ত অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে। সেটুকু করে দিয়েই সে বিদায় নেয়।"

২. "জীবনে যেখানে যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাটা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় বলে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।"

৩. "যুগের সঞ্চিত পণ্যের অগ্নিপরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে', 'কিন্নর কন্টে' শুনেছিলেন, তিনি এই উদভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।"

পুরানা পল্টন
বুদ্ধদেব বসু

'পুরানা পল্টন' প্রবন্ধটি একটি বিশেষ ক্ষণের স্মৃতিচারণায় বললে আশা করি ভুল হবে না। প্রবন্ধটি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রাবন্ধিক পুরানা পল্টনের বাড়িতে থাকাকালীন ছয় বৎসরের আনন্দঘন মূহুর্তের বর্ণনা দিয়েছেন। পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে তিনি সমস্ত কলেজ জীবন, সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায় ও যৌবনের উল্লেখ থেকে বিকাশকাল পর্যন্ত কাটিয়েছেন। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা, একান্ত আপনার যে জানালাটা যেখানে দিয়ে দেখে ফেলতেন অর্ধেক বিশ্ব, রেললাইন

দুটি প্রকান্ড বটবৃক্ষ এই সূক্ষ্মাতি স্মৃতিতে আজ পুরানা পল্টন প্রাবন্ধিকের চোখে বিশ্বের সব থেকে সুন্দর জায়গা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পাড়াটা সব্য হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উদ্দামতা কমে যায় এবং ধীরে ধীরে প্রাবন্ধিকের জীবনের আনন্দময় দিনগুলি হারিয়ে যায়। বুদ্ধদেব বসুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, বৃত্তি পাওয়া এবং তার সাথে 'প্রগতিকে নিয়ে কাজ শুরু করার বর্ণনা এই প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে।

তথ্য

১. বুদ্ধদেব বসুর 'পুরানা পল্টন' প্রবন্ধটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।
২. প্রবন্ধটি 'হঠাৎ আলোর ঝলাকানি' (পরিমার্জিত) প্রবন্ধগ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়।
৩. 'হঠাৎ আলোর ঝলাকানি' প্রবন্ধগ্রন্থের প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৯৩৫।
৪. 'হঠাৎ আলোর ঝলাকানি'র মোট দশটি রচনার মধ্যে প্রথমটি হল 'পুরানা পল্টন' (১৯৩২)।
৫. দেশ দেখা বুদ্ধদেব বসুর কপালে খুব কমই ঘটেছে। খানিকটা আর্থিক কারণে, কিন্তু বেশি দেশভ্রমণে স্বাভাবিক রুচির অভাবে।
৬. বুদ্ধদেব জানালা দিয়ে যে প্রকৃতি দেখতেন -
সন্ধ্যার মেয়ের রং,
সন্ধ্যার তারা
দ্বিতীয়ার নতুন বাঁকা চাঁদ।
৭. তাঁর ঘরের যেখানে যে জিনিস আছে, তার ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন হলেও তিনি বিরক্ত হন।
৮. পুরানা পল্টন উচ্চারনে বুদ্ধদেব বসু যে উপমা ব্যবহার করেছেন - 'অনেক দিন আগে যে মেয়েকে ভালোবাসতাম, হঠাৎ কেউ যেন আমার সামনে তার নাম উচ্চারন করলো। এতকাল যে নিতান্ত আপন ছিল তার নাম আজ কানে ঠেকেছে নতুন।'
৯. বুদ্ধদেব বসু যেদিন পুরানা পল্টন শেষবারের মতো ছেড়ে এসেছিলেন সেদিন তাঁর একটুও দুঃখ হয়নি স্থানবিশেষের জন্য। বরং ঢাকা ছাড়তে পেরে তিনি মুক্তির নিশ্বাস নিয়েছিলেন।
১০. "বর্তমানে যা অপ্রিয় তা স্মৃতিতে পরিণত হলেই তারও কোনো কাঁটা আর থাকে না, মনের মধ্যে তা কেমন ও সুগন্ধি হয়ে হানা দেয়" - পুরানা পল্টনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বলেছেন।
১১. পুরানা পল্টনের বাড়িতে বুদ্ধদেব বসু - যখন প্রথম গেছেন তখন তাঁর বয়স ১৭।
১২. পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে ৬ বছর কাটিয়েছেন। সমস্ত কলেজ জীবন, সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়। যৌবনের উল্লেখ থেকে বিকাশ।
১৩. বুদ্ধদেব বসু যখন পুরানা পল্টনের বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়িতে একটি ছেলের সঙ্গে প্রতিবেশিতার সূত্রে পরিচয় ঘটে, একই কলেজে পড়ার উপলক্ষ্যে তা পরিনত হলো বন্ধুতায়। শেষ পর্যন্ত যে কটি বন্ধু একত্রে হয়ে 'প্রগতি দল' বলে পরিচিত হয়েছিলেন তাদের প্রায় সকলের সঙ্গে এইরকম সময়ে প্রাবন্ধিকের আলাপের সূত্রপাত হয়।
১৪. তারপর পুরানা পল্টন বদলে গেল। বড় বড় বাড়িতে ভরে গেল, পাকা রাস্তা হল, ইলেকট্রিসিটি হল, দশ গজ পর পর বসলো জলের কল।
১৫. প্রাবন্ধিকের কাছে আগের দিনই ভালো ছিল যখন -
* বড় রাস্তার মোড়ে ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে তারপর জল কাদা পার হয়ে বাড়িতে আসতে হতো।
* বন্ধুরা মাঝে মাঝে সাইকেল ঘাড়ে করে এক হাঁটু কাদা ভেঙে তাঁর বাড়ি এসে পৌছাতেন।
* কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে তারার আলোয় পথ দেখে মাঠ পেরিয়ে তিনি বাড়ি ফিরতেন।
* শুক্লপক্ষে আকাশ ভরে আলোর বান ডাকতো।
১৬. বুদ্ধদেব বসু ফুটফুটে জোছনা রাত্রে দেখতে পেয়েছিলেন, এক ঝাঁক সাদা মূর্তি মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। তখন তাঁর ভালো লেগেছিল এই ভেবে যে তিনি পরির নাচ দেখতে পেলেন।
১৭. 'পুরানা পল্টনে'র যে জনিসটা প্রাবন্ধিক কখনো ভুলতে পারবেন না তা 'বর্ষার রূপ'।
১৮. প্রাবন্ধিকের পুরানা পল্টনের স্মৃতির মধ্যে ভীষণ ভাবে জীবন্ত ছবি হল দুটো বট গাছ। তাঁদের পাড়ার ঠিক বাইরে দুদিকে দুই প্রকান্ড গাছ একাধারে সিংহদ্বার ও দ্বারপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে, জানালার কাচে দাঁড়ালেই বুদ্ধদেব বসু তা দেখতে পেতেন।
* চৈত্র মাসে তাদের তলায় অনেক শুকনো পাতার ঝরে পড়তো।
* সন্ধ্যার শেষ সোনালি রশ্মিকে গাছ দুটোর মাথায় কতদিন আটকে যেতে দেখেছেন প্রাবন্ধিক।
১৯. বটগাছগুলির মধ্যে একটিতে একপাল শকুন বাসা বেঁধেছিল।
২০. প্রাবন্ধিক কলকাতায় চলে আসার কয়েকদিন আগে শুনেছিলেন গাছ দুটো কেটে ফেলার জন্য পাড়ার প্রবীণরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে। তাঁদের ধারনা শকুনদের জন্য পাড়ায় নানা রকম ব্যাধি ছড়াচ্ছে।

teachinns Text with Technology

২১. পুরানা পল্টনের যখন প্রথম গিয়েছিলেন তখন বোহেমিয়ানিজমকে সার করেছিলেন জীবনের। তিন মাসে একবার চুল ‘ছাঁদা’, স্নানাহার সম্বন্ধে অনিয়মকেই করে তুলেছিলেন নিয়ম। দিন রাত্রি যে কোনো সময়ে চায়ের দোকানে আড্ডা ছিল স্বর্গ।

২২. বুদ্ধদেব বসু আই এ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলেন। বৃত্তি পাবার টাকাতে ‘প্রগতি’ পত্রিকা ছাপার অক্ষরে বের করবেন ভেবেছেন প্রাবন্ধিক। মাত্র একশো টাকা হলে পত্রিকা চলবে। দশজন লোক নিজেদের মধ্যে পাওয়া গেলে তারা প্রতি মাসে ১০ টাকা করে চাঁদা দেবে।

২৩. “এই আশাতীত পুরষ্কার লাভে আমি ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দেশ দেখতে পেলুম”।

- বুদ্ধদেব বসু। ‘প্রগতি’ প্রকাশের সাফলে এই ভক্তি।

২৪. ক্লাস বন্ধ করে লেখকেরা দল বেঁধে আদিত্যের দোকানের সামনের বাঁশের উপর গোল হয়ে বসে চা খাওয়া চলতো প্রাবন্ধিকদের। বাড়ি ফিরেও বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত হৈ চৈ করার ফলে নিকটতম প্রতিবেশী শান্তিপ্রিয় মুনসেফ ভদ্রলোককে তাঁরা না জেনে কষ্ট দিয়েছেন।

উদ্ধৃতি

১. “প্রকৃতির এই আটপৌরে, অসাবধান রূপই আমাকে মুগ্ধ করে, যেখানে প্রকৃতি টুরিস্টের মনোহর করার জন্য পাহাড়ে আর জলপ্রপাতে, বিদেশী ফুলের বর্ণছটায় আর নীল হ্রদে নীলতর আকাশের ছায়ায় সেজেগুজে বসে আছে, যেখানে তার রূপ ভাঙিয়ে রেল - কোম্পানির তৈরি হয়, যেথা সে নিতান্তই সরকারিভাবে সুন্দর -
‘আমার মন তার প্রতি স্বভাবতই বিমুখ।’ (পুরানা পল্টন)

২. “এতদিনে আমি আমার নিজস্ব ছাঁচে গড়া হয়ে গেছি, মনের চেহারা আর বদলাবে না - যতদিন না রক্তের তেজ কমে আসে, জরার বাষ্পোদয়ে মনের স্বচ্ছতা আসে ঘোলাটে হয়ে।” (পুরানা পল্টন)

৩. “মেঘের মিছিলে গড়িয়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে আকাশের চেহারা, জানালার কাছে বসে বসে, আমি দেখতুম। ঠান্ডা হাওয়া ছুটতো, তার ছোঁওয়ায় এক আশ্চর্য সুখের স্রোত নামতো আমার মেরুদন্ডে।” (পুরানা পল্টন)

৪. “যত সুন্দর মন নিয়েই আমরা আসি না কেন, সংসারের চিহ্ন তাতে পড়বেই।”

৫. “জানি আমার জীবনের দীর্ঘ পথ এখনো সামনে পড়ে আছে, সিদ্ধির কীর্তির দিক থেকে সে অংশই প্রধান। জানি লোকে যাকে সুখ বলে তার আরো অনেক আমার জন্য অপেক্ষা করছে হয়তো।”

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 10

অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

'আধুনিকতা ও রবীনন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি আবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত প্রথম গ্রন্থ। এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং তারই সূত্র ধরে আধুনিকতার আলোচনা। কবিতায় নতুন আধুনিক কবিদের কাব্যশৈলী কতটা, হিতকর সাহিত্যের পক্ষে এবং সেই সমস্ত নব্য কবি এবং তাঁদের কাব্যের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আলোচনায় মুখর হয়েছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'অমঙ্গলবোধ ও আধুনিকতা' কবিতা প্রবন্ধে। দেশীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় কবিদের ও তাঁদের সহিত্য কীর্তিকে আলোচনার সম্মুখ প্রান্তে দাঁড় করিয়েছেন আধুনিকতার পাল্লা নির্ণয়ে।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা সহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে এক রোমান্টিসিজম যুগান্তর তৈরি করেছিলেন তার সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। প্রাবন্ধিক মনে করেন আধুনিক কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা একই সঙ্গে উপভোগ করা যায় না কারন রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তথা বিশ্বনিরীক্ষার সঙ্গে আধুনিক পাঠকের মনের মিল নেই। রোমান্টিকতা অন্যান্য কবিদের হাতে অচিরেই রিয়ালিজম বা সুররিয়ালিজম পরিবর্তিত হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্যে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কাল থেকে ভারতবর্ষে। এই চিন্তা চেতনা বা বাস্তব পরিকাঠামোর উপর ভর কজরেই 'কল্লোল', 'পরিচয়', পর্বের লেখকেরা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরোধী হয়ে ওঠেন। ফরাসি সাহিত্যিক বোদলেয়রের কাব্যচিন্তা, মানসিকতা এবং ব্যাক্তিগত সমস্যা তাঁর কাব্যকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সে সমস্ত আলোচনা আইয়ুব এ প্রবন্ধে করেছেন।

বিভিন্ন নব্যকালের কবিরা নিজেদের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হোয়ার জন্য আধুনিক বিষয়টিকে হাতিয়ার করেছেন। রীতি, শৈলী, যে বিষয় যে রস, আগে থেকেই সাহিত্যের শিখর দেশে পদচারণা করেছে, সেই রীতি, গরিমাকে ভেঙে ফেলে আলাদাভাবে সাহিত্যে প্রান সঞ্চার করাই মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিকতা বিষয়টির। প্রাবন্ধিকের স্পষ্ট মতামত প্রবন্ধের শেষে আমরা পাই তিনি জড়োয়া গয়নার ফ্যাশান বলতে আধুনিক সাহিত্যের কথাই বলেছেন, আরো বলেছেন বাজারি সাহিত্যের ফ্যাশান বদলাক, চিরন্তন সাহিত্য যে সাহিত্য চিরকালের আধুনিক, চিরকালের প্রতিষ্ঠিত তার গৌরব সুদূরপ্রসারি হোক।

তথ্য

১. আবু সয়ীদ আইয়ুব এর 'অমঙ্গলবোধো আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধটি 'আধুনিকতা ও রবিন্দ্রনাথ' এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

২. 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫ বৈশাখ, (এপ্রিল ১৯৬৮)।

৩. 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'বুদ্ধদেব বসু বন্ধু বরেষু'।

৪. দুঃখ ও পাপের যুগ্ম সত্তাকে ইংরেজিতে cyil বলে অভিহিত করা হয়, প্রাবন্ধিক তারই বাংলা করেছেন অমঙ্গল।

৫. প্রাবন্ধিক 'আধুনিকতাও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে গ্রন্থের পূর্বভাষ অংশে যে সমস্ত সাহিত্যিকদের নাম করেছেন এবং তাদের গ্রন্থের - রিলকের 'ভুইনো এলিজিম', এলিয়টের 'ফোর কোয়েটেমৈ', কামুর 'আউট সাইডার', মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', বিভূতিভূষনের 'পথের পাঁচালি', বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'।

৬. আইয়ুব তাঁর প্রিয়তম কবি বলতে অমিয় চক্রবর্ত্তীর কথাই বলেছেন।

৭. বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বোদলেয়র প্রভৃতি লেখকের উল্লেখ আছে।

৮. 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি অর্থাৎ 'অমঙ্গলবোধ ও আধুনিকতা কবিতা' অধ্যায়টি প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের হীরক জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'সাহিত্য নীতি ও শ্রেয়োনীতি' অমৃত-র শারদীয়া ১৩৭৩ সংখ্যায়।

৯. 'মানসী'র কবিতাগুলিতে সর্বপ্রথম নতুন যুগ প্রতিভার স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়।

১০. 'মানসী'র কবিতাগুলি রচিত হয় ১৮৮৭ - ৮৮ খ্রিস্টাব্দে - আজ থেকে আশি বৎসর পূর্বে।

১১. 'মানসী' প্রকাশের পর অর্ধশতাব্দী গত না হতেই রবীন্দ্র কাব্যবিচারের পটপরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

১২. ইয়েটস ১৯১২ সালে 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় লিখেছিলেন -
"These lyries display in their thought a would dreamed of all my life".

১৩. ইয়েটস জীবনের শেষ দশ পনেরো বছর নিজের কবিকর্মকে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস থেকে যতটা পারেন দূরে, যতখানি সম্ভব বিপরীতে সংস্থাপিত করেছিলেন।

১৪. কল্লোল ও পরিচয় যুগের কবিরা শিক্ষা পেয়েছিলেন কবিগুরুর পাঠশালাতেই, তাদের চোখ, কান, কণ্ঠ ও মন তৈরি হয়েছিল তাঁর সুরের ঝরনাতলায়।

১৫. বোদলেয়র, র‍্যাবো, মালার্মে, ভালেরি, অ্যালেন গিনসবাগ - তাঁদের কাব্যের জগৎ রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এঁরা রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ এবং বুদ্ধদেব বসুর উত্তরাধিকারী।

১৬. ‘যে আঁধার আলোর অধিক’ কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা বুদ্ধদেব বসু। কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৫০ সালে।

১৭. আইয়ুব ‘অমঙ্গলবোধ ও আধুনিক কবিতা’ প্রবন্ধে ‘আধুনিক’ বলতে আধুনিকতার সাধারন লক্ষনের কথাই বলেছেন। সেই সাধারন লক্ষনের মধ্যে একটি বড় লক্ষন হল কবিচিত্তে বিস্ময়বোধের অসাড়তা।

১৮. রবীন্দনাথ লিখেছিলেন -

‘জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।’

আধুনিক কবিরা সংক্ষেপের পক্ষপাতী তাই উপলব্ধি ও একটু সংক্ষিপ্ত -

‘জগতের মাঝে বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।’

১৯. দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে প্রবলেম অব্ ঈভিল এক বহু প্রাচীন এবং আজ পর্যন্ত নাছোড়বান্দা সমস্যা।

২০. ফ্রান্সে ভিক্টর উগোর নেতৃত্বাধীন কবিদের মধ্যে এবং ইংলন্ডে লেক স্কুলের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে রেমান্টিকতা ষোলো কলায় পূর্নবিকশিত ছিল। তার অবসান ঘটলো অমঙ্গলেরই প্রবল অভিঘাতে। ঘটালেন বোদলেয়র।

২১. বোদলেয়রকে বলা হয় প্রথম কাউন্টার রোমান্টিক এবং কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ।

২২. কবিতার ভঙ্গিটাই আসল, ভঙ্গিটাই পথ এবং লক্ষ্য, সাধনা এবং সিদ্ধি।

২৩. বোদলেয়র ভাবের দিক থেকে বিপ্লব ঘটিয়েছেন।

২৪. পোল ভালেরির মতে, বোদলেয়র ফরাসি সাহিত্যের উপর সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি, তাঁর কবিতা আধুনিকতার প্রতিভু।

২৫. ‘প্রথম দ্রষ্টা কমবিদের রাজা, স্য দেবতা।’ এই কথাটি বোদলেয়র সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৬. বোদলেয়রের কাছে বর্ষার ধারা নেমে আসে জেলখানার গরাদ হয়ে -

when the rain spreading its immense trails imitates a prison of bars.

২৭. বোদলয়ের কাছে - আকাশ নীল নয় চটচটে কালো -

“Can you illuminate a grimy, black sky, can you piesce shoudrs denner than, pith, with no morning on evening, no stars ..... The has snuffed the light at the window of the Inn.”

২৮. “যদিচ বোদলেয়রের পদ্যরীতি ও শব্দবিন্যাস বৈপ্লবিকভাবে নতুন, জীবন বোধে যে নূতনত্ব তিনি এনেছিলেন তা আরো মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ” - এলিয়ট বলেছেন।

২৯. প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে বোদলেয়রের বিতৃষ্ণার চারটি কারন নির্দেশ করেছেন যথা -

ক) প্রথম কারণটি ঐতিহাসিক। বোদলেয়র যখন কবিতা লেখা আরম্ভ করেন তখন রোমান্টিকদের রাজা ভিক্টর উগো।

খ) রোমান্টিসিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বয়ং বোদলেয়র বলেছেন -
‘রোমান্টিসিজম’ মূলত ‘একপ্রকার অনুভূতি’ এবং বিশেষত ‘অন্তরঙ্গতা’, ‘আধ্যাত্মিকতা’, ‘বর্ণবৈভব’, ‘অসীমের উৎকণ্ঠায়’।

গ) ‘ফ্যুর দ্য মাল’ এর ভূমিকায় খসড়ায় বোদলেয়র স্বয়ং ঘোষনা করেছেন - ‘লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরা কাব্যরাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন বহুকাল পূর্বে, সুতরাং আমাকে হতে হবে অন্য কিছু।’’

ঘ) বোদলেয়রের রচনায় রোমান্টিক ও ক্লাসিকের সমন্বয় ঘটেছে বলা যায়।

ঙ) বোদালেয়রের সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মনে হয়েছে এলিয়টের উক্তিই অধিকতর সত্য তা হল - ‘‘যদিও পরিবেশনগুনে তিনি ছিলেন রোম্যান্টিসিজমের সন্তান, কিন্তু স্বভাবগুণে তাকে হতে হল রোম্যান্টিসিজমের শত্রু।’’

৩০। বোদলেয়রের যে বিশেষনটি তাঁর সম্বন্ধে বারবার প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন সমালোচক তা হল ‘অধিগ্রস্ত’।

৩১। এলিয়ট বোদলেয়রেকে ‘সিম্বল অব্ মর্বিডিন্টি’ আখ্যা দিয়েছিলেন এবং প্রতি তুলনা করেছেন গ্যেটের সাথে।

৩২। রবীন্দ্রনাথ ‘আধুনিক কাব্য’র সাহিত্যের পথে’ প্রবন্ধে বলেছিলেন - ‘‘বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসা ------ এও একটা মোহ, এর মধ্যে শান্ত নিয়ামত্তচিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করায় গভীরতা নেই।

৩৩। নব্য ভাব বিলাসী কবিরা সংযমের ধার ধারেন না। তারা কালোকে যত বেশি কালো আর সাদাকে যত অদৃশ্য করে দিতে পারেন তাঁদের সাহিত্যে এতই তাঁরা খ্যাতি লাভ করেন। তাঁরা হলেন - বোদলেয়র, ফকনার জা জোন, সাঐ।

৩৪। জ্যাঁ পল সাঐ যাকে Saint Gent উপাধি দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন জাঁজেনে। এছাড়াও সাঐ জনৈক ‘সন্ন্যাসী’ বলেছিলেন।

৩৫। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন - ‘‘ হে রুদ্র তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোর হইতে নিষ্কৃতি পাই তোমাকেই লাভ করি। ------’’

৩৬। বোদলেয়রের মৃত্যুকে সম্বোন্ধন করে বলেছেন ----

“This country bores, O Death! Let us set sail” ।

৩৭। ফ্রান্সে বোদলেয়রের পর যে কাব্যশৈলী সবচেয়ে শক্তিমান কবিদের আনুগত্য লাভ করল তাকে ‘প্রতীকবাদ’ নামে অভিহিত করা হয়।

৩৮। আইয়বের মতে আধুনিক কাব্য ও শিল্পকলার সবচেয়ে জ্ঞানী ও সহৃদয় অধিবক্তা হলেন - জাক্ ম্যারিত্যাঁ।
৩৯। "A season in Hell" - কাব্যগ্রন্থ র‍্যাঁবোর।
৪০। পরম সুন্দরের আকর্ষন সমূলে বিনষ্ট করতে চাইলেন মালার্মে একটি স্মরনীয় কবিতায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে যার শিরোনাম 'নীলিমা'।
৪১। সুন্দর ও বাস্তব

সুন্দর ও বাস্তব
আবু সয়ীদ আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুব 'সুন্দর ও বাস্তব' প্রবন্ধে সুন্দর কথা ঠিক ঠিক কি অর্থে প্রকৃত সুন্দর বলা চলে সেই বাস্তবসম্মত আলোচনা করেছেন। সুন্দর ও বাস্তবের অর্থ এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষনের প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রাবন্ধিক সৌন্দর্যের অবস্থান কোথায়। তা কি দৃশ্য বস্তুর ধর্ম, না কি দ্রষ্টার মনোগত প্রতিক্রিয়া মাত্র এ নিয়ে মতবৈষম্য রয়েছে। যাঁদের মতে সৌন্দর্য বস্তুগত, আমাদের দেখা - না দেখার উপর নির্ভর করে না, তাঁদের প্রমানের ভিত্তি ছিল সুন্দর বস্তুর কোনো একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবগুণের সঙ্গে তাঁর সৌন্দর্যের সমীকরন।

সুন্দর কথাটি ঠিক যে অর্থে ব্যবহার করা যায় তা হল বেটোফেনের নবম সিম্ফনি সুন্দর, রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশগামী বলাকা সুন্দর আশ্বিনের মেঘের উপর সূর্যাস্তের অন্তিম বর্ণদৃষ্টান্ত সুন্দর। সুন্দর মানেই যে তা প্রীতিকর হতেই হবে তার অর্থ অমূলক। আবার প্রীতিকর মানেই যে সুন্দর তাও সমর্থনযোগ্য নয়। 'ম্যাকবেথ' কে প্রীতিকর বলা শক্ত হবে কিন্তু তা নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের দাবি রাখে। অর্থাৎ সুন্দর কথাটির সংজ্ঞা ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব স্বকপোল কল্পিত বিষয়। যে ব্যক্তি বিশেষের অনুভূতি যেমনতর সৌন্দর্যের স্বাতন্ত্র্যতা তাঁর কাছে তেমনি আনন্দময়। এইভাবেই বলা যেতে পারে প্লটহিনস্ বস্তুর সারল্যের মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন আর বর্ণ পেয়েছেন আয়তনের মধ্যে।

বস্তুর বাস্তবতার মানেই হচ্ছে অপরূপর সকল বস্তুর সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সার্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। এই নিয়মসূত্র গ্রহন্তে যে বস্তু বাধা দেয় যার ব্যবহারে ব্যত্যয় ঘটে তাকেই আমরা বলে থাকি অলীক, অবাস্তব। সুতরাং বলা যায় সুন্দর বাস্তব বা অবাস্তবের গন্ডীতে আবদ্ধমান নয়। সুন্দরের অভিজ্ঞতার বিষয় ও বিষয়ার সমস্ত বিভেদ সমস্ত ব্যবধান মুছে যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন ঘটে। পরিশেষে বলা যায় সুন্দরের বাস্তবতার সংজ্ঞা নিরূপন করতে গেলে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। কারন সৌন্দর্যের অর্থ ঈশ্বরবাদীদের কাছে এক আলাদা সত্ত্বার রূপক আবার হেগেলবাদীর কাছে অন্য প্রতিরূপক।

Text with Technology

তথ্য

১। 'পথের শেষ কোথায়' প্রবন্ধের অন্তর্গত সুন্দর ও বাস্তব প্রবন্ধটি।
২। 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থটির আবু সায়ীদ আইয়ুব উৎসর্গ করেছিলেন -
'আমার প্রিয়তম করি অমিয় চক্রবর্তী শ্রদ্ধাস্পদেষু
এবং
আমার স্নেহাস্পদ স্বপন মজুমদার সুহৃদয়েষু।
৩। 'পথের শেষ কোথায়' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৩৮৪ আষাঢ়, জুলাই ১৯৭৭।
দ্বাদশ সংস্করণ - ২০১৮
৪। আবু সায়ীদ আইয়ুবের 'সুন্দর ও বাস্তব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে।
৫। 'সুন্দর ও বাস্তব' প্রবন্ধে সুন্দর কথাটি যে যে উন্নীত অর্থে ব্যবহার করা হবে --
- বেটোজেনের নবম সিমফনি সুন্দর,
- রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ-গামী বলাকা সুন্দর,
- আশ্বিনের বৃষ্টিরিক্ত মেঘের উপর সূর্যাস্তের অন্তিম বর্ণছটা সুন্দর।

৬। সুন্দর যে সে প্রীতিকর হতেও পারে, কিন্তু প্রীতিকরতা তার মর্মকথা নয়, অপরিহার্য অঙ্গত্ত নয়।
৭। 'ম্যাকবেথ'কে প্রীতিকর বলা শক্ত হবে, যদিও সৌন্দর্যের দাবি তার অবিসংবাহিত।
৮। সৌন্দর্য উপলব্ধি মাত্রই আনন্দময়, সে আমাদের স্ফুরণ কিন্তু চিত্তের উর্ধ্বতম অন্তরীক্ষে, সন্দেশভক্ষণজাত প্রীতির সমপর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না।

৯। যারা বলতেন সৌন্দর্য বস্তুগত, আমাদের দেখা না দেখার উপর নির্ভর করে না, তাঁদের প্রমানের ভিত্তি ছিলো সুন্দর বস্তুর কোনো একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব গুণের সঙ্গে তার সৌন্দর্যের সমীকরণ প্রতিসাম্য অর্থাৎ Symmetry গুণটাই বিশেষরূপে তাঁদের চোখে পড়েছিলো।

১০। সৌন্দর্য শব্দের একটা সুবিদিত সংজ্ঞা গণিতশাস্ত্রে দেওয়া হয়ে থাকে, সে সংজ্ঞা অনুসারে অল্পবিস্তর প্রতিসামান্য শতদল পদ্মে কিংবা তাজমহলে পরিলক্ষিত হয়।

১১। গহন অরণ্যকে, নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রির তারকা খচিত ছায়াপথ প্রজ্বলিত আকাশকে অথবা মানব জীবনেরই মতো প্রকাশ বৈচিত্র্যাবন 'ফর্সাইট সাগা'কে প্রতিসাম্যিক বলতে গেলে নিরীহ সৌন্দর্য শব্দের উপর বড়ো অত্যাচার করা হয়।

১২। সৌন্দর্য আর প্রতিসাম্য যদি সমার্থবাচক হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি সযত্ন অঙ্কিত নিখুঁত বৃত্তের মূল্য মোনালিসার ছবির চেয়ে বহুগুণে বেশি।

১৩। প্লটাইনস্ বস্তুর সারল্যের মধ্যে তার সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিলেন।

১৪। বর্ক্ আয়তনের স্বল্পতায় সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছিল।

১৫। সৌন্দর্যের বিচারে অসীম বৈষম্য দেখা যায়। যেমন -
যে তাজমহলের শুভ্র সমুজ্জ্বল মূর্তি রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল, 'অল্ডস হক্সলির দৃষ্টিতে এই স্থাপত্য শিল্প অজস্র দোষো দুষ্ট।

১৬। টল্স্টয় শেক্সপীয়রের বিপুল বিধাতৃতুল্য সৃষ্টির কোনো দিতে প্রস্তুত নন।

১৭। চৈনিক বা রাজপুত দ্বিরায়তনিক চিত্রের সমাদর বিশেষজ্ঞের কাছে কম নয় কিন্তু আমরা তাতে রস পাই না।

১৮। বিচারের পৈররীত্য প্রমাণ করেছে যে তাজমহল স্বয়ং সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়, রবীন্দ্রনাথের মনে ঐ বস্তুর সাক্ষাতে যে অনুভূতি জাগে সৌন্দর্য তার 'ধর্ম এবং হক্সলির মনে যে ভাবের উদ্রেক হয় তাকেই অসুন্দর বলা সমীচীন।

১৯। লক্ বস্তুর গুণসমূহকে দুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন।
প্রথম গুণ আকৃতি, অভেদ্যতা প্রভৃতি, বস্তুর নিজস্ব ও নিরপেক্ষ ধর্ম।
দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণ হল বর্ণ গন্ধ উষ্ণতা ইত্যাদি। এদের উৎপত্তি বিষয় ও বিষয়ীর সংঘাতে, অবস্থিত প্রত্যক্ষকারীর চৈতন্যে।

২০। একটি পয়সাকে সামনে থেকে দেখলে বৃত্তকার দেখায়, পাশ থেকে বৃত্তাভাসিক; দূর থেকে বিন্দুবৎ। এর মধ্যে বৃত্তটাকে পয়সার নিজস্ব ধর্ম এবং অন্যগুলোকে মনোগত বলা অন্যায়।

২১। নৈয়ায়িক সঙ্গতির দাবি মানলে স্বীকার করতে হবে যে, আকৃতিও মনোগত, প্রত্যক্ষকারীর বেদনামাত্র। তেমনি অভেদ্যতাও আমাদের ত্বাচ ও গতিবেদিনী (Kindesthetic) প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল।

২২। বস্তুর বাস্তবতায় বিশ্বাস ধার্মিক সুলভ গোঁড়ামি। কান্ট থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত অনেক ছোট বড়ো দার্শনিককে এর খন্ডনের চেষ্টায় প্রাণপাত করতে হয়েছে।

২৩। দুটি দল জ্ঞানতান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক।

২৪। বস্তুতান্ত্রিকদের গবেষণা সর্ববাদিস্বীকৃত না হলেও প্রণিধানযোগ্য।

২৫। বস্তুতান্ত্রিকরা তৃতীয় পর্যায়ের গুণ অর্থাৎ সৌন্দর্য; শ্রেয়তা ও সত্যের অবস্থিতি নির্ণয় নিয়ে দিশেহারা হয়েছেন।

২৬। সৌন্দর্যানুভূতির যে লক্ষণটা সবচাইতে সুবিদিত ও অপ্রতর্কিত সে হচ্ছে তার তন্ময়তা।

২৭। একাধিপত্য বাস্তবতার পরিপন্থী। কারণ কান্টের দোহাই না পেড়েও আজ আমরা বলতে পারি কোনো বস্তুর বাস্তবতার মানেই হচ্ছে অপরাপর সকল বস্তুর সঙ্গে তাকে কতকগুলো নিত্য ও সর্বভৌম নিয়মের সূত্রে গ্রথিত করা। এই নিয়ম সূত্রে যে বস্তু বাঁধা দেয় যার ব্যবহার প্রত্যয় ঘটে তাকেই আমরা বলি অলীক, অধ্যাস, অবাস্তব।

২৮। যাকে অবস্তাব বলি - যেমন রজ্জুদর্শনে সর্পভ্রম। যে সর্প আপন জৈবধর্ম পালন করে না, কাছে গেলে ফনা উদ্যত করে ছোবলাতে আসে না, তাড়া করলে বঙ্কিম গতিতে পালায় না। সেই হল অবাস্তব।

২৯। সম্বন্ধ যেখানে আরোপিত হয়নি অবাস্তবতা সেখানে অর্থহীন।

৩০। যে প্রবৃত্তিনিরোধ ও নিরালম্ব ধ্যানে সক্ষম তাকেই বলা হয় রূপদক্ষ।

৩১। সৌন্দর্য তা সে প্রাকৃতই হোক আর শিল্পপ্রসুতই হোক মানবমনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে বাধ্য।

৩২। এ যুগের শিল্পীদের চিত্রকল্প ও মানসপ্রতীক বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড তাকে অবলুপ্ত মিশরী - সভ্যতার আভাস পেয়েছেন।

৩৩। বাস্তব সম্পর্কহীন সুন্দরের আছে অন্তঃসঙ্গতির বিপুর ঐশ্বর্য এই অন্তঃসঙ্গতিকে এলেকজান্ডার সুন্দরের কেবল কল্পনামূর্তি নয় তার প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব ভিত্তি তারও বৈশিষ্ট্য জ্ঞান করেন।

৩৪। মৃণাল বাহু ও ড্রেন পাইপের কোনো বস্তুগত পার্থক্য খুজলে চলবে না। এর জন্য দায়ী আমাদের সুকুমার কলাপদ্ধতির যুগযুগান্তর ব্যাপী প্রথা।

৩৫। বাংশানুক্রমে আমরা প্রীতকরের মর্মরেবীতে সুন্দরের উপাসনা করে এসেছি। অপ্রীতিকরের রূপসাধনা বিংশ শতাব্দীর নবধর্ম।

৩৬। সৌন্দর্যের অন্তর্নিহিত দিক ছাড়া স্বাতিক্রমের দিকও আছে।

৩৭। সুন্দরের অভিজ্ঞতায় বিষয় ও বিষয়ীর সমস্ত বিভেদ সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন ঘটে।

৩৮। আলেকজন্ডার মনে করেন যে, সৌন্দর্যের অবস্থিতি বস্তুতেও নয় মনেও নয়, তাদের এই সম্মিলিত সত্তাই সুন্দর উপলব্ধির প্রকৃত উপাধি।

৩৯। ক্রোচের সৌন্দর্যতত্ত্বের মর্মকথা উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির অভিন্ন তাতেও এই সম্মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে।

৪০। ক্রোচের মতে অন্ত:প্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, এ দুটো সম্পূর্ণ অসমজাতিক ক্রিয়া প্রথমটা তত্ত্বগত এবং দ্বিতীয়টা ব্যবহারগত।

৪১। অন্তঃপ্রকাশের সঙ্গেই অভিব্যক্তির তাদাত্ম্য, বহিঃপ্রকাশকে ক্রোচে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গই মনে করেন না।

৪২। ক্রোচের কাছে উপলব্ধি ও অন্তঃপ্রকাশ অভিন্ন।

৪৩। বাস্তব শিল্পী সামগ্রীকে সুন্দর বলতে ক্রোচ একান্তই অনিচ্ছুক।

৪৪। ক্রোচের কাছে আন্তঃপ্রকাশের মধ্যে টেক্‌নিক্ অবর্তমান, সাধারণ মানুষও এতে বঞ্চিত নয়, তবে প্রকাশের গভীরতা ও ব্যপকতার তারতম্য অবশ্য অনিবার্য। এ ক্ষমতা না থাকলে শুধু যে রসসৃষ্টি অসম্ভব তাই নয় রসসম্ভোগও অসাধ্য।

৪৫। চিত্র বা সঙ্গীত যে অর্থে উদ্দীপক ছাপার অক্ষরে কবিতা সে অর্থে উদ্দীপক নয়, তাকে বরঞ্চ উদ্দীপকের উদ্দীপক বলা যেতে পারে।

৪৬। কলিংউড - এর কাছে সুন্দরের দ্যোতনায় দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুয়েরই অতীত একটা বৃহত্তর সত্তার ইঙ্গিত নিহিত আছে। সৌন্দর্যের একটি স্বতোবিরুদ্ধতার কথা কলিংউড উল্লেখ করেছেন।

৪৭। কলিংউড যে অভিব্যক্তির কথা বলতে চেয়েছেন তা অনুভবগত, চিত্তগত নয়।

৪৮। কলিংউড অভিব্যক্তির বহিরাশ্রয়ী বিশাল অর্থ করেছেন তার জন্য নিশ্চয়ই তিনি হেগেলের প্রবর্তিত ব্রহ্মবাদের কাছে ঋণী।

৪৯। ইন্দ্রিয়গম্যের ইন্দিয়াতীতের আবির্ভাব। কথাটা এতোই ব্যাপক যে, সমস্ত বিজ্ঞানকে অনায়াসে এর পরিধির মধ্যে টেনে আনা যায়।

৫০। নিউটনের জীবনের কাহিনী সেই আপেল পতন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন এই প্রবন্ধে তার উল্লেখ পাই।

৫১। আর্টের ইন্দ্রিয়াতীতে সম্পর্কে হেগেল বাদীরা বলবেন তাঁদের সেই ধর্ম আর শতাব্দীব্যাপী ব্যাখ্যার পরে আজও সন্দেহ দূর হয় না যে, তার পরিগ্রহণে যুক্তির চেয়ে নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাই অধিক।

আধুনিক বাংলা কবিতা
আবু সয়ীদ আইয়ুব

প্রাবন্ধিক 'আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে কবিতার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিক কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতা ঠিক যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, তার মূলে রয়েছে আধুনিক ইংরেজি কবিতার প্রভাব। এক্ষেত্রে মধুসূদন দত্তই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। এর পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ এসে বাংলার প্রাচীন কাব্যের একটি ধারাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সাম্প্রতিক ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে দুটি বিপরীত আন্দোলনের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল। প্রতীকী এবং সাম্যবাদী। আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের একদল কোনদিক থেকে কবি নন। আবার সাম্যবাদী দলে সমর সেনের মত কবিও আছেন।

আধুনিক বাঙলা কবিতা থেকে রোমান্টিক মনোভাব অন্তর্ধানের পথে চলেছে। পূর্বতন সমস্ত ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলাই হালের ফ্যাশন। আর এর ফলে কবিতার রূপ মিছে কিছুটা বিবৃত আধুনিকের। পরিশেষে প্রাবন্ধিক তাই-ই প্রশ্ন করেছেন - নতুন কবিরা যদি নতুন করে প্রেমের কবিতা না লেখেন তা হলে আমাদের একালের মনের কথা যে মনেই থেকে যায় প্রকাশের আনন্দ পায় কেমন করে?

তথ্য

'ভূমিকা : আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালে।

ভূমিকা : আধুনিক বাংলা কবিতা

১. এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৭ সালে।

২. ড্রাইডেন তাঁর সমসাময়িক নগণ্য নাট্যকারগণকে গ্রিক ও এলিজাবেথীয়দের চেয়ে শ্রেয় মনে করেছেন Measure for Measure-এর ভাষাকে vulgar আখ্যা দিয়ে গেছেন।

৩. ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে প্রামাণ্য কাব্যসংকলনের সম্পাদক পলগ্রেভ। তাঁর সংকলনগ্রন্থে ক্যাম্বেলের এগারোটি কবিতা বর্তমান এবং লংফেলের তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে। সেখানে ডান্ কিংবা ব্লেকের জায়গা হয়নি।

৪. ভিন্ন দেশের রুচি ভিন্ন, কোনো একটি দেশেও যুগে - যুগে তার অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মহৎ তুচ্ছ হয়ে যায়, তুচ্ছ মহৎ।

৫. আর্টের স্বতিক্রমণশীলতায় বিশ্বাস প্রাচীন, তবে হেগেলের দুর্নিবার ব্যক্তিত্বের ছাপ পেয়ে উনিশ শতকের নন্দনশাস্ত্রে এর অসম্ভব পরিব্যাপ্তি দেখা যায়।

৬. এ. সি. ব্র্যাডলি কাব্যের বিশুদ্ধতা ও অনন্যাধীনতার পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে কাব্যের মূল্য তার প্রকাশ রূপে নয়, সে-রূপের অতীত কোনো এক বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনায়।

৭. শিল্পের উদ্দেশ্য ধর্মনীতি প্রচার, এমন কথা সোজাসুজি কেউ না বললেও আর্টের মূল্য যে অনেক পরিমাণে নৈতিক, গত শতাব্দীতে এই মত শেলি, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, তলস্তয় প্রভৃতির সমর্থন লাভ করেছিলো।

৮. "It si society itself which under communism becomes the work of art" - এৎস্কির উক্তি।

৯. প্রানধর্মের অনুশাসন থেকে দুটি দিকে মুক্তির পথ পাওয়া যায় - দর্শনে আর শিল্পকলায়। দর্শন বিশুদ্ধ concept সমূহের বিন্যাসের মধ্যে অন্তঃসঙ্গতি আনতে চায়; শিল্পীর কারবার image নিয়ে।

১০. কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ - পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র - প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।

১১. তৃতীয় দশকে নজরুল ইস্লাম, যতীন সেনগুপ্ত প্রভৃতির শক্তি ও সাহসের ফলে সে সর্বজয়ী প্রতিভা একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের ঘোষণা করে নবীন বাঙালি কবিদের নিজেকে চিনবার এবং চেনাবার সুযোগ দেখা দিল।

১২. রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতির প্রচলন করে, কাবের বিশিষ্ট ভাষা বর্জন করে, কবিকুল - পরিত্যক্ত 'অসুন্দর' প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশকে গ্রহণ করে নিজের ঐতিহ্য নিজেই ভেঙেছেন।

১৩. অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা কাব্যে দুটি মূল ধারা প্রবাহিত ছিল বৈষ্ণব ও মঙ্গলকাব্যের ধারা। মঙ্গলকাব্যের দেশজ রূপ ভারতচন্দ্রের হাতে সংস্কৃত হয়ে দরবারী সূক্ষ্মতা, ছন্দোচাতুরী ও অলঙ্কার ব্যসন লাভ করেছিল। মধুসূদনের সময়ে ভারতচন্দ্রই সবচেয়ে প্রতিষ্ঠালব্ধ ও অনুকরণযোগ্য কবি ছিলেন। এছাড়া তখন দাশরথী রায়ের পাঁচলী আর রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত ছিল জনপ্রিয়তার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে।

১৪. রবীন্দ্রনাথ এসে বাঙলার প্রাচীন কাব্যের একটি ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, বৈষ্ণব ভক্তি ও ভাবার্দ্রতা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে যুক্ত করলেন লেকস্কুলের প্রকৃতি - বন্দনা, তাতে কিছু আমেজ দিলেন উপনিষদীর অধ্যাত্মরসের।

১৫. সাম্প্রতিক ইউরোপে, অন্তত ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে দুটি প্রায় বিপরীত আন্দোলনের প্রভাব সবচেয়ে প্রবল, প্রতীকী এবং সাম্যবাদী। প্রতীকী আন্দোলন রোম্যান্টিসিজমেরই পুনরাবর্তন,তবে তার সঙ্গে এর মিল যতখানি, গরমিলও তার চেয়ে কম নয়।

১৬. প্রতীকী কবিদের ভাষা ব্যবহারে যে গুণটা সবচেয়ে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে অভূতপূর্ব নির্বাহুল্য। শব্দচয়ন এত নিঁখুত এবং বাক্যনির্মাণ এত ঘন যে এলিয়টের পক্ষে সম্ভব হয়েছে আস্ত একখানি উপন্যাসকে "Portrait of a Lady" -র মত ছোটো কবিতায় সন্নিবিষ্ট করা।

Text with Technology

উদ্ধৃতি

১। 'সুরুচি মানে ভালো কবিতা চিনবার শক্তি, এবং ভালো কবিতা তাই-ই যা রুচিবানেরা বরণ করেন, এমন একটি স্থুল চক্রিক ন্যায় যে কেমন করে তাঁদের সূক্ষ্ম২ সুকুমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়, তার রহস্য বাণীর বর পুত্ররাই জানেন।'
[ভুমিকা : আধুনিক বাংলা কবিতা]

২। আমাদের চিৎপ্রকর্ষের সমস্ত প্রেরণাকে আপাতত নিয়োগ করতে হবে এই বিকলাঙ্গ সমাজের পুনর্গঠনের জন্য।
[ঐ]

৩। 'এই আশুবিলীয়মান সভ্যতার ধূলি ধূরসিত পটভূমিকায় ফুটে উঠেছে নতুন এক সমাজের অরুণরেখা।'
[ঐ]

৪। ''এই মানস পুতুলগুলিকে সে খুশি মতো ভাঙে আর গড়ে, সাজায় আর গুছায়। সে ভাঙাগড়ার খেলায় একমাত্র তার মনোগত সৌষ্ঠবের দাবি ছাড়া আর কিছুই সে মানে না, ব্যবহারজগতের কোনো বিধিই সে পালন করে না। জৈববিজ্ঞানের আধিপত্য থেকে সে মুক্ত।''
[ঐ]

৫। কবিতায় ভালো মন্দ যাচাই নিতান্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল, তাতে সর্বসম্মতির দাবি করতে যাওয়া হয় মূঢ়তা নয় অহংকার। সে যাচাই আমরা যে রূপদক্ষ রুচি নিয়ে করি তা সেই রসনা রুচির সগোত্র যার কল্যাণ কেউ আম খেয়ে সুখ পান, কেউ বা আমসত্ত্ব পছন্দ করেন।
[ঐ]

৬। আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে একদল হচ্ছেন যাঁরা ভাব কিংবা ভঙ্গি কোনোদিক থেকে কবি নন। এঁরা যে কর্তব্যবোধের প্রবর্তনার গোলদীঘি থেকে সুদুর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখেছেন। এতে তাঁদের প্রোপাগান্ডার বসত কতখানি হাসিল হয় বলা শক্ত তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগী ব্যাক্তি তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে না দেখে পারে না। [ঐ]

৭। নতুন কবিরা যদি নতুন করে প্রেমের কবিতা না লেখেন তা হলে আমাদের এ কালের মনের কথা যে মনেই থেকে যায়, প্রকাশের আনন্দ পায় কেমন করে?'' [ঐ]

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 11
আমার জীবন
রাসসুন্দরী দাসী (১৮০৯ - ১৯০০)

'আমার জীবন' গ্রন্থখানির ভূমিকায় (গ্রন্থ পরিচয় অংশে) দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন - ''এই জীবনখানি ব্যক্তিগত কথা বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। ইহা প্রাচীন হিন্দু রমণীর একটি খাঁটি নক্সা'' যে সময় হিন্দু নারী পর্দানশীন ছিলেন এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের কোন অগ্রাধিকার ছিল না, ঠিক সে সময় রামসুন্দরী দেবীর, হিন্দুরমণীদের কথা জীবনচিত্র বর্ণনা করা যথেষ্ট এক সাহসী পদক্ষেপ। সেকালের নারী চরিত্রের ভয়, লজ্জা ও গ্রাম্য সংস্কার কি ভাবে বিকাশ পেত তার একটি সুপষ্ট ও জীবন্ত দলিল 'আমার জীবন' গ্রন্থখানি। ১২৮৩ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'আমার জীবন' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আত্মজীবনী গ্রন্থ।

রাসসুন্দরী দেবী প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতিও ছিল না। বিদ্যাচর্চার প্রবল বাসনায় ঘরে বসেই তিনি বহু গ্রন্থ পাঠ করে সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুরাগ থেকে চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি পাঠ করেছেন।

'আমার জীবন' গ্রন্থটিতে লেখিকা বনেদি পরিবারের বধূ হিসাবে স্বামী-সন্তান-শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সবিস্তারে বর্ননা করেছেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় অন্দরমহলের চালচিত্র ও নারীর শিক্ষা পরিসরের সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। বধূ হিসেবে এক বুক ঘোমটা টেনে তার পরিবারের প্রতিটি কর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। সেকালের প্রেক্ষাপটে কন্যা থেকে বধূ, বধূ থেকে গৃহিণী, ও জননীরূপে কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন রাসসুন্দরী দাসী তার বিস্তৃত বিবরণ আছে এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটিতে। দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থ বলেছেন --
'' এই চিত্রের সম যথাযথ ও অকপট মহিলা চিত্র আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই।''

প্রথম ভাগ - মঙ্গলাচরণ

প্রথম রচনা - জীবন চরিত, কবিতান্তর বালিকা কাল, ছেলেধরার ভয়, গঙ্গা স্নানে গমন, স্কুলের কথা।
দ্বিতীয় রচনা - কবিতা, আমার ভয় ও দয়ামাধব ঠাকুর, বাড়ীতে আগুন ধরা, আমি মায়ের মেয়ে; আমার ভয় ও দয়ামাধব ঠাকুর; আমার তিন ভাই-বোন নিরাশ্রয়, দয়ামাধবকে ডাকা, লেখিকার সরলতা।
তৃতীয় রচনা - কবিতায় করুণার কল্পতরু কে? মহামন্ত্র পরমেশ্বরের নাম, খুড়ীমার কথা, মা তুমি কি আমায় পরকে দিবে, বিবাহের আয়োজন, শ্বশুরবাড়ি গমন।
চতুর্থ রচনা - কবিতা; নৌকার মধ্যে আমার ক্রন্দন ও লোকের সান্ত্বনা, শাশুড়ী নিজের মা ভাবা, নূতন বধূ, মাটির সাপের গল্প, সংসারের কাজ, সেকালের বৌদের নিয়ম।
পঞ্চম রচনা - কবিতা, রামসুন্দরী দাসীর কাজের ফাঁকে লেখাপড়া শিখিবার সাধ, সেকালের লোকের আলোচনা, পরমেশ্বর তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, রামদিয়া গ্রামের কথা, পুত্র কন্যাদের কথা, সংসারের বিবরন।
ষষ্ঠ রচনা - কবিতা, লেখাপড়া শিখিবার প্রবল বাসনা, স্বপ্নে চৈতন্য ভাগবত ও উক্ত গ্রন্থের একখানি পাতা; লেখাপড়ায় লোক নিন্দার ভয়; সেকালের লোকাচার।
সপ্তম রচনা - কবিতা, গৃহিণী কর্ম্মের ভার; আমার তিনটি ননদ, জয়হরি খোড়ার কথা, সন্তান ও সংসারের সুখের বর্ণনা।
অষ্টম রচনা - পতিতপাবন, দীনবন্ধুকে নিয়ে কবিতা, সংসার লহরী, আমার পুত্রবধূ পুরান শুনিবার সাধ; চৈতন্য ভাগবত, পুস্তক পড়বার কথা, পুত্রশোকের যন্ত্রণা।
নবম রচনা - কবিতা রচনা, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, আর্চার পর্ব, জৈমিনি ভারত, গোবিন্দ লীলামৃত, বিদগ্ধ মাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি পুরান ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ। সপ্তকান্ড বাল্মীকি রামায়ন। পুস্তকপাঠ ও ক্রন্দন, লিখিতে শেখা।
দশম রচনা - কবিতা, শরীরের অবস্থা, স্বামীর মৃত্যু, বৈধব্য দশা।
একাদশ রচনা - কবিতা, ঈশ্বরের কাছে পূর্নভাবে আত্মসমর্পনের চেষ্টা, পরিবারের কর্ত্রী হয়ে ওঠা
দ্বাদ্বশ রচনা - পরমপিতার নাম গানে নিজের পরিপূর্ণ করে তোলার প্রচেষ্টা।
ত্রয়োদশ রচনা - কবিতা, স্বপ্ন বিবরণ, মনের অলৌকিকতা, অন্তরে স্পষ্ট দর্শন, মৃত্যু- কল্পনা।
চতুর্দশ রচনা - কবিতা, প্রকাশ্যে ভূত দৃষ্টি
পঞ্চদশ রচনা - কবিতা, কর্ত্তার সম্পর্কে বর্ণনা।
ষোড়শ রচনা - কবিতা, রামদিয়ার ১২৮০ সালের জ্বর বর্ণনা।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম রচনা - দুর্লভ মানব জীবন বৃথা গেল।
দ্বিতীয় রচনা - ভবসাগর পারাপারের জন্য কবিতাকারে মধুসূদনের কাছে প্রার্থনা, গীত, জীবন-রত্ন নিরর্থক ক্ষয় করার জন্য আক্ষেপ।
তৃতীয় রচনা - সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাতে তিনি সর্বজনবিদিত পুষ্করিনীর বিবরণ, বেশর উদ্ধার এবং মদনগোপালের চূড়াতে ঝুলিয়ে দেওয়া।
চতুর্থ রচনা - কবিতা, মদনগোপালের চরণে কোটি প্রণাম।
পঞ্চম রচনা - কবিতা, আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার মহিমা কি জানিতে পারি।
ষষ্ঠ রচনা - কবিতা, আমার ভাগ্যে সাধুদর্শন হইল না।
সপ্তম রচনা - কবিতা, গীত, মানবজন্ম বৃথা গেল।
অষ্টম রচনা - কবিতা, পরমেশ্বরের দয়ায় শরীরে রোগ বালাই কিছু ছিল না।
নবম রচনা - কবিতার মাধ্যমে প্রভুকে না ভোলার কথা, সংসারযাত্রা। প্রসন্তান, দৌহিত্র, দৌহিত্রীর সংখ্যা। দশটি পুত্র সন্তান, দুই কন্যা সন্তান মোট বারটি সন্তান। এক্ষনে অবশিষ্ট আছে চারটি পুত্র ও একটি কন্যা। পৌত্র -১৪, দৌহিত্র -২, পৌত্রী -৮, দৌহিত্রী -১, সর্বসমেত -২৫ জন।
দশম রচনা - সংসারযাত্রা, রামনাম করলে কোটি জন্মের পাপ বিনাশ।
একাদশ রচনা - কবিতা।
দ্বাদশ রচনা - সংসারযাত্রা, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের পরিবর্তন হয়ে কলিযুগ। গীত।
ত্রয়োদশ রচনা - শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বর্ণনা।
চতুর্দশ ও পঞ্চদশ রচনা - কবিতা, আমার জীবন চরিত - দ্বিতীয় ভাগ - এই পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকিল। লেখিকা তাঁর বই ছাপানোর পর বই বিক্রয় করে ঐ টাকা দিয়ে মদনগোপালের মহোৎসব করার ইচ্ছা প্রকাশ করে গেছেন।

মনশিক্ষা

তথ্য

১। 'আমার জীবন' গ্রন্থটির লেখিকা রাসসুন্দরী দাসী ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে পারনা জেলার কাছে পোতাজিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার ১২১৬ সালের চৈত্র মাসে।
২। ১৮৯৯ খ্রিঃ বাংলার ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রাসসুন্দরী দাসী মারা যান।
৩। নিরক্ষর এই গৃহবধূ আঠারো থেকে একচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বারোটি সন্তানের জন্ম দিয়ে, তাদের লালন পালন করার ফাঁকে ফাঁকেই নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন।
৪। ১৮৭৬ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর 'আমার জীবন' গ্রন্থটি ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়।
৫। অষ্টাশি বছর বয়সে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ ও তিনি সংশোধন করে দেন।
৬। 'আমার জীবন' গ্রন্থটির প্রস্তাবনা লেখেন শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশটি দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা। 'প্রস্তাবনা' অংশটি ২০ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জে লেখা।
৭। 'মঙ্গলাচরণ' শ্লোকটি ত্রিপদীতে লেখা। চরন সংখ্যা - ৮ শুরুর অংশটি

বন্দে সরস্বতী মাতা তুমি বল বুদ্ধিদাতা,
গন্ধর্ব কিন্নর তব বান্ধ্য।

শেষ অংশটি

এই আশা করি মনে, তব প্রিয়পতি মনে,
আমার কণ্ঠতে কর বাস।

৮। প্রথম রচনার শুরুতে 'জীবন চরিত' নামাঙ্কিত একটি ছয় চরণের কবিতা লিপিবদ্ধ হয়েছে।
৯। পঞ্চম পঞ্চম-র পঞ্চমরচনায় রামসুন্দরী তাঁর বয়ঃক্রমে সন্তানদের জন্ম বিবরণ দিয়েছেন।
ক) রামসুন্দরীর ১৮ বছর বয়সে বিপিনবিহারী নামে পুত্রের জন্ম হয়।
খ) ২১ বছর বয়সে পুলিনবিহারী নামে পুত্রের জন্ম হয়।
গ) ২৩ বছর বয়সে রাসসুন্দরী নামে কন্যার জন্ম হয়।
ঘ) ২৫ বছর বয়সে প্যারীলাল নামে পুত্রের জন্ম।
ঙ) ২৮ বছর বয়সে রাধানাথ নামে পুত্রের জন্ম হয়।
চ) ৩০ বছর বয়সে দ্বারকানাথ নামে পুত্রের জন্ম হয়।
ছ) ৩২ বছর বয়সে চন্দ্রনাথ নামে পুত্রের জন্ম হয়।
জ) ৩৪ বছর বয়সে কিশোরীলাল নামে পুত্রের জন্ম হয়।
ঝ) একটি পুত্রসন্তান ৬ মাস গর্ভে থেকে মারা যায়।

ঞ) ৩৭ বছর বয়সে প্রতাপচন্দ্র নামে পুত্রের জন্ম হয়।
ট) ৩৯ বছর বয়সে শ্যামসুন্দরী নামে কন্যার জন্ম হয়।
ঠ) ৪১ বছর বয়সে মুকুন্দলাল নামে পুত্রের জন্ম হয়।

১০। রাসসুন্দরীর শ্বশুরবাড়ির ঘোড়াটির নাম জয়হরি।

উদ্ধৃতি

১। ''কোন গাছের বাকল কোন গাছে লাগিল।''
[প্রথম ভাগ, চতুর্থ রচনা।]

২। ''আমি পিঞ্জর -- বদ্ধ বিহঙ্গী।''
[প্রথম ভাগ - পঞ্চম]

৩। অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ সৌরবা:। অতিদানে বলিবদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্।
- সপ্তম রচনার অংশ।

৪। জগতজীবন তুমি জগতের যার দোঁহাই দোঁহাই প্রভু দোঁহাই তোমার -
- অষ্টম রচনার অন্তর্গত।

৫। "সংসার তরঙ্গ হইতে সমুদ্রের তরঙ্গ বোধহয় বড় জয়ী হইতে পারে না, সময়ে সময়ে তুল্যই হয়।"
(প্রথম ভাগ অষ্টম রচনা)।

৬। "আয় আয় চাঁদ, আমার চাঁদের কপালে চিক্ দিয়ে যা" -
- অষ্টম রচনার অংশ।

৭। "অস্ত্রের প্রহার ও পুত্রশোক কখনও সমান হইতে পারে না। অস্ত্রাঘাত মনুষ্যের শরীরে যদি অধিক পরিমাণে হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে। আর যদি কিছু অল্প পরিমাণে হয়, তাহা হইলে যে পর্যন্ত শরীরে অস্ত্রের ঘা থাকে, সেই পর্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই ঘা যখন শুকাইয়া যায়, তখন আর শরীরে জ্বালা যন্ত্রনা কিছুই থাকে না। কিন্তু শোকাঘাত যাবজ্জীবন পর্যন্ত থাকে।"
(প্রথম ভাগ - অষ্টম রচনা)

৮। "শোক হইলে লোক মৃত্যু ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু, মৃত্যু হয় না, মৃত্যুর অধিক ফল হয়।"

৯। 'মৃত্যুর অধিক ফল মস্তক মুন্ডন'
(দশম রচনার অংশ)

১০। "তুই শমন কি করিবি জারি, তুই শমন কি করিবি,
আমি কালের কাল কয়েদ করেছি।
মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে, হৃদ -গারদে বসায়েছি।"
(ষোড়শ রচনার অন্তর্গত, রাগিনী জঙ্গলা - তাল একতলা)

১১। "হায়রে হায়, আমার মানব জন্ম বৃথা গেল। মানুষ্য জন্ম দুর্লভ জন্ম, সে দুর্লভ মানবদেহ পাইয়া রাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দ না ভজিয়া মন, তুমি এই মাকাল ফলে ভুলে রহিয়াছে।"
(দ্বিতীয় ভাগ - প্রথম রচনা)

১২। ও রাঙ্গাচরন, ভজনবিহীন, আমি অভাজন অতি মিছা প্রবঞ্চনে, তরঙ্গ তুফানে, সতত বিস্মৃত মতি।
(দ্বিতীয় ভাগ - দ্বিতীয় রচনা)

১৩। "যিনি জগৎ কারন, বিশ্বব্যাপী নিরঞ্জন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহাতে। নাই তাঁর স্থানাস্থান। আছেন তিনি সর্বস্থান, অবিদিত নাই ত্রিজগতে।"
(তৃতীয় রচনা)

১৪। "সাধুসঙ্গের সনে অপবিত্র দেহ পবিত্র হয়। আমি এমনি হতভাগ্য নরাধম, পশুপক্ষী হইতেও অপদার্থ। আমি সাধুদর্শন পাইলাম না।"
(একাদশ রচনা)

১৫। 'চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, আঠারপর্ব জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, বাল্মীকি পুরান - এই সকল পুস্তক ঐ বাটীতে ছিল। কিন্তু বাল্মীকি - পুরানের আদিকান্ড মাত্র ছিল, সপ্তকান্ড ছিল না'।
(নবম রচনা)

১৬। "সাপ হয়ে কামড়াও ওঝা হয়ে ঝাড়, হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পোয়াদা হয়ে মার।"
(দশম রচনা)

১৭। কি আমার অন্তরঙ্গ, কি বৈরঙ্গ, কিম্বা প্রতিবাসিনী, কি কোন দেশস্থ লোক, কেহ যে কখন কোন প্রকারে আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল এমন আমার স্মরণ হইল না। আমি এই জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

(একাদশ রচনা)

১৮। "এ দেহে তায় পেলাম নারে আর কি পাব দেহ গেলে, ধিক্ ধিক্ জনম মানবকুলে। হরিপদ না ভজিয়ে দিন গিয়াছে হেলে হেলে।"

(দ্বিতীয় ভাগ - সপ্তম রচনা)

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 12

সাময়িকপত্র

তত্ত্ববোধিনী □বঙ্গদর্শন □ প্রবাসী □ সবুজপত্র □ কল্লোল

তত্ত্ববোধিনী

তথ্য

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।
২। সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।
৩। পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য - "অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা, কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোনও দৈববিপাকে ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত হইতে আশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাটিতে প্রকটিত হইবেক।"
৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশ ও বিকাশের প্রধান কর্ম উদ্যমটি ছিল ভাষা - সাহিত্য - সমাজ সচেতন একাধিক সম্পাদকের। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫। একটানা নব্বই (৯০) বছর ধরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।
৬। তত্ত্ববোধিনীর নয়জন সম্পাদক ছিলেন। প্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত। এবং শেষ সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার -

সম্পাদকের নাম	সম্পাদকের সময়কাল
ক) অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৪৩ - ১৮৫৪ খ্রীঃ
খ) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৫৯ - ১৮৬০ খ্রীঃ
গ) অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	১৮৬৫ - ১৮৬৭ খ্রীঃ
	১৮৬৯ - ১৮৭২ খ্রীঃ
ঘ) হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন	১৮৬৭ - ১৮৬৯ খ্রীঃ
	১৮৭৭ - ১৮৮৪ খ্রীঃ
ঙ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৮৪ - ১৯০৮ খ্রীঃ
চ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯১০ - ১৯১৫ খ্রীঃ
ছ) নবীনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়	১৮৫৫ - ১৮৫৯ খ্রীঃ
জ) তারকনাথ দত্ত	১৮৬০ - ১৮৬১ খ্রীঃ
ঝ) আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ	১৮৬১ - ১৮৬২ খ্রীঃ

৭। ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে রচিত হলেও 'তত্ত্ববোধিনী'তে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনী, পুরাতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে লোককল্যানের জন্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
৮। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার কণ্ঠে "একমেবা - দ্বিতীয়ম্" বাক্যটি মুদ্রিত হয়।

বঙ্গদর্শন

তথ্য

১। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা রূপে 'বঙ্গদর্শন' ১৮৭২ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।
২। 'বঙ্গদর্শন' বাঙালির মনন ও সাধনা এবং সাহিত্যচর্চার বলিষ্ট মাধ্যম।
৩। 'বঙ্গদর্শন' যখন বের হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ৩৪ বৎসর।
৪। গনমানসে বঙ্গদর্শনের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -
"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।"

৫। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ১ পিপুলপাতি লেনের সপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে। মুদ্রক ও প্রকাশক ব্রজমাধব বসু।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেছেন -
ক) বাংলার সর্বসাধারনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য।
খ) সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে হবে কিন্তু বাল্য-পাঠ্য রচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হবে না।
গ) বিদ্বান, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী ও মুলেখকগুণ বিশিষ্টরাই বঙ্গদর্শনের লেখক হতে পারবেন।
ঘ) বঙ্গজাতির মধ্যে ইতিহাস চেতনা জাগ্রত করে বাংলার ইতিহাস রচনার উৎসাহিত করা।
ঙ) বাংলার সামাজিক সমস্যাগুলির পুনর্বিচার ও সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাওয়া।
চ) জাতিয় জীবনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলে উন্নয়নমূলক স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা।
ছ) বাঙালির সাহিত্যক্ষুধা বাড়ানো ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করা।
জ) সাহিত্যের উপযোগী ভাবদর্শ ও ভাষাদর্শ গড়ে তোলা।

৭। বঙ্গদর্শনের নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী হলেন - চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর বন্দোপাধ্যায়, পূর্নচন্দ্র বসু, তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, কৈলাশচন্দ্র সিংহ প্রমুখ।

৮। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শনের পরিকল্পনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ছিলেন।

৯। বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চারবছর চলে। ১৮৭৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত।

১০। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা করে প্যারীমোহন কবিত্বের গান বাঁধেন -

"বঙ্গদর্শন দর্শনশক্তি চমৎকার
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার,
. . . . . .
এখন গ্রন্থ ঘরে ঘরে,
Editor বহু পরে,
কিন্তু কলম যে কী রূপে ধরে তা অনেকে জানে না,
ভূষিমাল গর্দার ভরা
ভেতরেও ময়লা পোরা
কাগজগুলো কেবল ভালো
Binding পরিপাটি।"

teachinns Text with Technology

প্রবাসী

তথ্য

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসে এলাহাবাদে থাকাকালীন সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' (১৯০১) প্রকাশ করেন।

২। তিনিই পত্রিকাটির পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন।

৩। রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' নামাঙ্কিত কবিতা আশীবাদ রূপে শিরোধার্য করে প্রবাসীর পথ চলা শুরু। -

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব বুঝিয়া।"

৪। প্রবাসী পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার প্রথম পাতাতেই মুদ্রিত থাকত মুখবানী।

৫। প্রবাসীর মুখবানী ছিল কবি টেনিসনের কবিতার পংক্তি।

Beauty, good and knowledge are three sisters to look on the Nobel forms Makes Nobel thro the sensors organism that which is higher.
মুখবানীতেই প্রকাশ, প্রবাসী সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকেই অবলম্বন করবে।

৬। সারস্বত সাধনা অর্থাৎ সাহিত্য - শিল্পের চর্চা যেমন থাকবে, জ্ঞান - বিজ্ঞানের বিচিত্র অঙ্গনে সহজ বিচরন থাকবে।

৭। ভাষাতত্ত্ব, পরিভাষা, জাতিতত্ত্ব, পক্ষীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল প্রবাসী।

৮। ১৩১৪ সালে অর্থাৎ পত্রিকা প্রকাশের সপ্তম বর্ষে ও মুখবানীতে টেনিসনের উক্তি বর্জন করে সংস্কৃত ভাষার নির্দেশিত দুটি নীতি যুক্ত হয়। তা হল -
১. 'সত্যম শিবম সুন্দরম'.
২. ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ.

৯। 'প্রবাসী' বাঙালিদের বাংলা ভাষাচর্চায় অনুপ্রাণিত করতে 'প্রবাসী পদক' নামে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।

১০। 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশের শুরু বৈশাখ, ১৩০৮ থেকে কার্তিক, ১৩০৯ পর্যন্ত এলাহাবাদে ইন্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হত। পরবর্তী অগ্রহায়ণ কলকাতার কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হতে থাকে।

১১। ‘প্রবাসী পত্রিকা’ প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই রামানন্দ ১৩০৯ সালে ‘চিত্রপরিচয়’ বিভাগটি চালু করেন। এই বিভাগটির মধ্য দিয়ে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
১২। নব্যভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র, প্রকাশের প্রথম গৌরব রামানন্দেরই প্রাপ্য।
১৩। প্রবাসীতে প্রকাশিত স্মরণীয় ছবি রাফায়েলের ‘ম্যাডোনা’ তাইকান ও হিসিডা নামের জাপানি শিল্পীর আঁকা ‘কালী’ ও ‘সরস্বতী’।
১৪। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে -
“সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসমালোচনা” বিভাগটির সূচনা হয়।
১৫। প্রবাসীর অপর একটি বিভাগ ‘কষ্টিপাথর’ বিভাগটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে চালু হয়েছিল।
১৬। বৈশাখ, ১৩২০ বঙ্গাব্দে ‘পঞ্চশস্য’ নামে অপর একটি জনপ্রিয় বিভাগ চালু হয়। বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের নানান খবর। এই বিভাগে প্রকাশিত হত।
১৭। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে ‘দেশের কথা’ শিরোনামে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সেটি ‘দেশবিদেশের কথা’ শিরোনাম ধারন করে।
১৮। বৈশাখ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ‘মহিলা মজলিস’ নামে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শান্তা দেবী ‘মহিলা মজলিস’ বিভাগটি পরিচালনা করতেন।

সবুজ পত্র

তথ্য

১। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ‘সবুজপত্র’ প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে।
২। ‘বীরবল’ ছদ্মনামে তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।
৩। প্রত্রিকাটি দুটি পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। প্রথম পর্যায় - বৈশাখ, ১৩২১। দ্বিতীয় পর্যায় - ১৩৩২।
৪। সবুজ পত্রের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। প্রচ্ছদপটে যৌবনের রঙ সবুজের উপর সাদা রঙের একটি তালপত্র আঁকা থাকতো।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সবুজের অভিযান’ দিয়েই যাত্রা শুরু ‘সবুজ পত্রে’র।
৬। ‘সবুজ পত্রে’র লেখক গোষ্টি হলেন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুল গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জাটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।
৭। প্রমথ চৌধুরী বাঙালি জাতির একটি গুরুতর অভাব অনুভব করেছেন, তা হল - ‘আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা তারই জ্ঞান’ প্রমুখ চৌধুরী সবুজপত্রের মাধ্যমে বাঙালি জাতির এই অভাব দূর করতে চেয়েছেন।
৮। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমথ চৌধুরীকে ‘নতুন কিছু’ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বাঙালির জাতীয় জীবনে যে নতুনত্ব এসে পড়েছে, তাকেই স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করবার জন্য তিনি সবুজপত্র প্রকাশ করেছেন।
৯। ‘পশ্চিমের প্রাণবায় যে ভাবের বীজ বহন করে আনছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গড়তে পারছে না বলে শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে’ সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে চেয়েছেন।
১০। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ - আমেরিকা ভ্রমন পর্বে গীতাঞ্জলির (১৯১০ খ্রীঃ) বাণী ও অধ্যাত্মবাদের বার্তা পৌছে দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সাধনা’ প্রকাশের মতোই প্রমথ চৌধুরীকে দিয়ে ‘সবুজপত্র’ প্রকাশ বা বাংলা সাহিত্যে সবুজের অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
১১। মননশীল সাহিত্য রচনার মহৎ আদর্শ সৃষ্টি করার জন্য পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল।

কল্লোল

১। ‘কল্লোল’ এর সূতিকাগার হল ‘ফোর আর্টস ক্লাব’। দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, সুনীতি দেবী ও সতীপ্রসাদ সেন ট্র এই চারজনের একান্তিক প্রচেষ্টায় এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ঘটে।
২। দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ এর যুগ্ম সম্পাদনায় ‘কল্লোল’ এর প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩০ - এ প্রকাশিত হয়।
৩। ১০।২ পটুয়াটোলা লেনে অবস্থিত দীনেশরঞ্জনের মেজদা বিভুরঞ্জনের বাড়ির ঠিকানায় কল্লোল প্রকাশিত হতে থাকে।
৪। পত্রিকার প্রচ্ছদপটে, এমনকি বিজ্ঞাপনে কল্লোলের পরিচয় দেওয়া হয় - ‘বাংলার মাসিক গল্প - সাহিত্য পত্রিকা’ রূপে।
৫। কবিতার জন্য কল্লোলের দরজা সবসময় উন্মুক্ত ছিল। ‘কল্লোল’ নামাঙ্কিত কবিতা দিয়েই পত্রিকার যাত্রা শুরু -

“আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আজ নিশিদিন।”

৬। কল্লোল পত্রিকায়, ১৩৩০ থেকে পৌষ, ১৩৩১ সংখ্যা পর্যন্ত 'সংগ্রহ' নামে একটি বিশেষ বিভাগ চালু ছিল। 'আলোচনা' নামে একটি বিভাগ চালু ছিল। 'সমাচার' নামে অপর একটি বিভাগ ছিল। এই বিভাগে দেশ বিদেশের নানা সংবাদ মন্তব্যসহ পরিবেশিত হত। 'পরিচয় লিপি' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। 'ছবি' নামে কল্লোলের আরেকটি বিভাগ ছিল।

৭। 'কল্লোল' পত্রিকাটি প্রায় সাত বছর ধরে চলেছিল।

৮। ৭ বছরে ১১টি মৌলিক উপন্যাস, ২টি অনুদিত উপন্যাস, ও ১৬৬টি গল্প প্রকাশ পায় 'কল্লোল' পত্রিকায়।

৯। সাত বছরে কল্লোলের একটি নিজস্বলেখক গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। দীনেশরঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীতি দেবী, প্রবোধ সান্যাল, সরোজকুমারী দেবী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রমথনাথ বিশী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, সুনির্মল বসু, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ এক ঝাঁক শিল্পী 'কল্লোলে'র পাতা ভরিয়ে তুলেছিলেন।

১০। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ঢাকায় 'প্রগতি' ও কলিকাতায় 'কালি-কলম' পত্রিকার প্রকাশ হয়।

১১। 'কল্লোল' - এ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর কবিতায় -

"সম্মুখে থাকুন পথ রুধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আপন কক্ষের থেকে জালিব যে তীক্ষ্ণ আলো
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।'

teachinns
Text with Technology